বিজয়িনী

শ্রীশ্রীপতি মোহন ঘোষ

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

[আশ্বিন ১৩৩১]

"মানসী প্রেস"
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বিজয়িনী

এই লেখকের লেখা—

সহচরী সম্বন্ধে "যমুনার" নিরপেক্ষ সমালোচক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল এর অভিমত।—আমরা উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি, পুস্তক খানির চরিত্রগুলি সজীব রক্ত মাংসে গঠিত। দোষে গুণে মানুষ, মানসিক ভাব বিশ্লেষণে গ্রন্থকার কম কৃতিত্ব দেখান নাই। চরিত্রগুলির মধ্যে মায়া, মায়ার মা, ও প্রিয়বালার চরিত্র অতীব সুন্দর হইয়াছে। মহিমের জ্যাঠাইমারও শ্বশুরের চরিত্র দু একটি রেখায় তিনি যেরূপ ফুটাইয়াছেন তাহা সুদক্ষ শিল্পীর উপযুক্তই হইয়াছে, পুস্তকখানি উপন্যাসপ্রিয় পাঠক পাঠিকাদিগকে আনন্দ দিতে পারিবে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ঐ গ্রন্থকার কৃত—

অভিসার—১৲, **বন্দিনী**—১৲, **মণিহারা**—॥৹,
স্বয়ম্বরা—১॥৹, **শুভদৃষ্টি**—॥৹, **স্বর্ণমরু**—॥৹
ভালবাসা—১৲, **দেনমোহর**—॥৹,
সাধের বিয়ে—১।৹

বিজয়িনী

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ প্রবেশ লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। স্বামী বলিলেন, গৃহ যখন তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে তখন একটা শুভ দিন দেখিয়াই গৃহপ্রবেশ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী বলিলেন, পাঁজি পুঁথির লক্ষণ মিলাইয়া চলা তাঁহার দ্বারা পোষাইবে না। সামনের ভাল দিনেই নূতন বাড়ীতে তিনি গৃহ প্রবেশ করিবেন। স্বামী আর বাদানুবাদ করিতে সাহস পাইলেন না, এটা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল, স্ত্রীর বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করা—তবু আপনার মনকে বুঝ দিবার জন্য—

স্বামী বৃন্দাবন চন্দ্র পাশের বাড়ীর কৈলাস জ্যোতিষীকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, কৈলাস জ্যোতিষী পাজি বগলে করিয়া বাইরের ঘর হইতেই হাঁকিয়া কহিলেন, "ওগো বৌমা আগামী বিশে বৈশাখ শুভ তৃতীয়া তিথিতে বেলা সাতটা বেয়াল্লিশ মিনিটে, অতি সুন্দর যোগ আছে।—এ কয়টা মাস মা এই পাড়াতেই থাকিয়া যাও।"

অন্দরের মধ্যে স্ত্রী অমিতা হিসাব করিয়া দেখিলেন, পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র তবে বৈশাখ—পাঁচ মাসের ধাক্কা—এতটা সময় সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য ;—ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, কিছু মূল্য ধরিয়া দিলে যদি ভাল দিন পাওয়া যায়, তাই জানিয়া আয়।

কৈলাস মূল্য ধরার নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরে পাগলী মেয়ে, মূল্য ধরে দিলে কি সু-দিন পাওয়া যায়? আচ্ছা দেখি, বলিয়া আবার পুনঃ পুনঃ আপনার পুঁথির পাত উল্টাইয়া গেলেন। কিন্তু কোন মতেই ভালদিন পাইলেন না! বলিলেন, ভালদিন যদিও পাওয়া যায় কিন্তু এই কালটা যে অকাল।—"

বৃন্দাবনও চুপি চুপি কৈলাসকে বলিয়া দিলেন, আপনি বলুন না মূল্য দিলেও ভাল দিনের দেখা মিলবে না। সাফ জবাব দিয়ে দিন।

কৈলাসকেও বাধ্য হইয়া অগত্যা গৃহস্বামীর কথাই রাখিতে হইল। আসলে কথাটা হইতেছিল এই—অনেক দিন পাড়াটায় আছে বলিয়া বৃন্দাবনের এই স্থানটার পরে স্বাভাবিক একটা মমতা দাঁড়াইয়া-গিয়াছিল। আপদে বিপদে যাহারা তাহার উপকার করিয়াছে তাহাদের ফেলিয়া যাইতে সহসা তাহার মন চাহিতে ছিল না। অমিতার পক্ষেও ঐ এক কারণ ছিল। কলিকাতায় দক্ষিণ অঞ্চলের দিকেই ছিল তাহার বাপের বাড়ী,—তাহার দাদাই জোগাড় যন্ত্র করিয়া জায়গা কিনিয়া ভদ্রপল্লীর মধ্যে বাড়ীটুকু তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিল। ভবানী-পুরের দিকে তার বন্ধু বান্ধবও অনেক ছিল, সময়ে অসময়ে তাহারা যে না আসিবে তাহা একেবারে অসম্ভব। এপাড়া অপেক্ষা ওপাড়ায় দিকেই তার মনটা যেন হু হু করিয়া ছুটিতেছিল।

স্বামীর এই বাধাটায় তাই তাহার ভারি একটু লাগিল। স্বামীত তাহার

এরকম আচরণ কখন করেন নাই, স্বামীর ভাত খাবারের সময় ব্রাহ্মণের সাক্ষাতেই অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, কেন বাড়ী যদি না তৈয়ারী হতো তা হ'লে বরং কথা থাকতো। এ রকম বাজে প্রেজুডিস নিয়ে কোন বুদ্ধিমান লোক চলতে পারে এ আমার ধারণাতেই ছিল না।—

স্বামী তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং কাছারীর পোষাক পরিয়া পান না লইয়াই বাহির হইয়া গেলেন। অবশেষে পানের ডিবাটা ব্রাহ্মণ ঠাকুরই গাড়ীতে গিয়া দিয়া আসিল।

অমিতা ভাবিতে লাগিল, এ পরাজয়টা তাহার কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারিল? সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল স্বামী ত তাহার ইচ্ছার প্রতীক মাত্র, স্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি কি করিয়া মত দিতে পারেন? ভাবনাকুল নেত্রে কয়েকবারই বারান্দাটা পরিভ্রমণ করিয়া আসিল। কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। শঙ্কিত হইয়া ঘরের মধ্যের বড় আয়নাটার সম্মুখে একবার দাঁড়াইল—দেখিল যেরূপ দিয়া এতদিন সে তাহার স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সে রূপের ত বৈপরীত্য ঘটে নাই। সেই টানা ভুরু—বিদ্যুৎ কটাক্ষ—সবই তেমনি রহিয়াছে, তবে স্বামী তাহার মতের বিরুদ্ধে এমন ধারা জোর প্রতিবাদটা করিল কেন?

অমিতার চোখ দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল! তাহার মনে হইল যেন স্বামীর সোহাগ সে হারাইয়াছে, একটা শঙ্কাও তাহাকে আক্রমণ করিল। হয়ত স্বামী তাহার কদর্য্য গোপনতম কিছু দেখিয়া ফেলিয়াছে—মনের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেশ করিয়া পরখ করিয়া দেখিল, কোথাও নিজের গলদ দেখিতে পাইল না। আহার নিদ্রা

ফেলিয়া অভিমান ভরে কাঁদিতে বসিল, মেয়ে আসিয়া মায়ের বিষণ্ণ অশ্রু সজল চোখের সামনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াইল। অমিতা মেয়ের হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া বালিকার মত কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "মা আমি হারিয়েছি।"

ছোট মেয়ে কিছু ভাবিয়া পাইল না। মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হারিয়েছে মা?"

মা বলিল "সর্ব্বস্ব!"

মেয়ে সর্ব্বস্ব কথাটার অর্থ ঠিক ধরিতে পারিল না, তবে বুঝিল একটা কিছু সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে। মেয়ে মাকে টানিয়া লইয়া বলিল "চলো মা আমি ত তোমার আছি। বালিকা দুই হাতে মায়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিল।

অমিতা যেন এইবার কতকটা জোর পাইল, বলিল, "ঠিক বলেছিস মা, কেউ না থাকলেও তুই আছিস্।"

পাশের বাড়ীর প্রভাবতী বেলা দ্বিপ্রহরে বেড়াইতে আসিত সে আজ শুষ্ক মুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—বুঝি পান হ'তে চুণ খসে গেছে?

প্রভা কতকটা সফ্রেজেট্ জাতীয়া স্ত্রীলোক ছিল। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের প্রত্যেক আচরণেই সে কেমন অসহিষ্ণু হইয়া মন্তব্য প্রয়োগ করিত। সাদা ভালবাসার কথার মধ্যেও পুরুষের নীচ স্বার্থ মাখান প্রাণের কদর্য্য অভিসন্ধি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিত, আর মেয়েদের সাবধান করিয়া বলিত পুরুষের ইচ্ছার কাছেই আত্ম বিক্রয় করিবার জন্যই জগতে তোমাদের সৃষ্টি হয় নাই।

প্রভাবতীর কথার উত্তরে অমিতা তাই অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভাই প্রভা তোমরা যা বলো তা সত্যি, কতদিন তোমাদের

কথা ঠিক মত ধারণাতে আন্‌তে পারি নি, কিন্তু সত্যই—পুরুষের ইচ্ছার দ্বারে আমরা বন্দিনী ছাড়া আর কিছুই নই।" সংক্ষেপে ওবেলাকার ঘটনাটাও বলিয়া গেল।

প্রভা স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে তাই দলে পুরুর কামনাটা বেশী করিত। চোখ দুটা কপালে তুলিয়া বলিল, "তোমরাই দ্যাখ ভাই আমি আর কি বলবো, তোমরা তখন পতি দেবতা বলে কাণ্ডজ্ঞান হারাতে না? দেবতাকে যতই প্রাণেশ্বর, প্রাণ, প্রিয়তম বলে ডাকো তিনি তোমাদের নরকের দ্বার ছাড়া আর কিছুই বলবেন না?" অমিতা ক্ষোভ ক্ষিন্ন স্বরে বলিল, এর বিরুদ্ধে কিছুই কি করবার উপায় নেই আমাদের?—

প্রভাবতী বলিল, "নিশ্চয় আছে। নিজের হাতে নিজের বন্ধন মোচন করা।"—

বৃন্দাবনচন্দ্রের বন্ধু বান্ধবের কাছেও কথাটা ছাপা থাকিল না, কতকটা সে নিজমুখেই বলিয়াছিল, কতকটা কৈলাসও গল্পচ্ছলে বলিয়া গিয়াছিল, একেই পাড়ার লোক জানিত বৃন্দাবন সাধারণ স্বামীদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশীমাত্রায় স্ত্রৈণ, তাহার উপর দ্বিতীয় পক্ষে সে বিবাহ করিয়াছিল। বৌটিও ছিল সুন্দরী, আর কিছু বেশীমাত্রায় শিক্ষিত। পাশের বাড়ীর সাত ছেলের বাপ তেজচন্দ্র বলিল, "কি হে বৃন্দাবনচন্দ্র, তোমার দ্বিতীয় পক্ষটির নাকি আর একদণ্ড এখানে পোষাচ্চে না। কেন চক্রবেড়ের হাওয়া না হ'লে বুঝি অসুবিধা হচ্চে?"

অন্য একজন শ্লেষ করিয়া বলিল, শুধু অসুবিধা নয় অনেকখানি নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটচে।

এ সব বন্ধুরা বৃন্দাবনের গোড়ার অবস্থা ভালরকম জানিত, তাই কথাবার্ত্তায় ইহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না। বৃন্দাবনও উহাদের

সহিত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া গল্প করিয়া দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ক্লান্তি অপনোদন করিত।

একটু একটু ডোজও কিছুদিন হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, প্রথমটা অনেক বন্ধু ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল বৃন্দাবনের তাহার জন্যে কাহারও কাছে পয়সার তাগিদ নাই। বরং না আসিলে জবাব দিহি করিতে হইত তখন নিশ্চিন্তে বন্ধুরা আনাগোনা আরম্ভ করিল। এবং বৃন্দাবনচন্দ্রের উদার আতিথেয়তায় দ্বিতীয় পক্ষ বনাম দেবীপক্ষের প্রচুর উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করিল। শোনা যায়, প্রথমটা দেবী পক্ষ এই জয় ধ্বনিতে যথেষ্ট সুখী হইয়াছিলেন। সেদিন কিন্তু দেবীপক্ষ মুখটা আঁধার করিয়া বৃন্দাবনকে বাড়ীর মধ্যে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাড়ীর মধ্যে এ রকম বেল্লিকপনা বরদাস্ত হবে না, তা বলে রাখছি।"

বৃন্দাবন বলিলেন, "ঐ বন্ধুবান্ধবদের দলে ভিড়বো না এই কথা তো।"

অস্মিতা বলিল, "হাঁ।—"

বৃন্দাবন চোরের মত মুখটা নীচু করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। বলিল, "বন্ধুগণ আজ হ'তে বাইরের ঘরে গল্প করা আর পোষাবে না। কারণ এতে তাঁর বড়ই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটচে।"

ক্ষেত্র বলিয়া একটী অতিথি সে ত একবারে আকুল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "মার পূজা বন্ধ হবে?"

বৃন্দাবন বলিল, "তাছাড়া উপায় কি? পরক্ষণেই বন্ধু সাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ওহে বাড়ী না হয় গঙ্গার ঘাট আছে, গঙ্গার ঘাটে না পোষায় গঙ্গায় পান্সীর অভাব নেই। সেই বেড়ে হবে! 'ধরো না' কেন ডুবে ডুবে যদি জল খাওয়া যায় শিবের বাবাও টের করতে পারবেন না।"

বন্ধু তেজচন্দ্র বলিলেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ্ অনেকেই করে বৃন্দাবন, তাই বলে তোমার মত এমন ধারা বয়ে যেতে কাউকে দেখি নি।

বৃন্দাবন কয়েকটা ঢোক গিলিয়া বলিল, কি জানো দাদা একে সুন্দরী স্ত্রী, তাতে বিদ্যার জাহাজ তাতে তিনি উলের কাজ জানেন। ভাল ভাল বিলেতী নবেল পড়তে পারেন; মেয়ের পড়ার তদারকও করতে পারেন মাষ্টারের কাছে—এ অবস্থায়—

ঠাট্টার সম্পর্কে একজন এই কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি বৌঠাকরুণের তদারকে মাষ্টার মূর্চ্ছা যায় না ত? আহা বেচারা মাষ্টারও যদি হতে পারতুম।'—সে ভাবিল খুব খানিকটা রসিকতা করিয়া লইলাম।

বৃন্দাবন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, "সে গুড়ে বালি কেষ্টচন্দ্র, আমার বাড়ীতে বৃদ্ধ ছাড়া কোন যুবজনের প্রবেশ নিষেধ জেনে রেখো। এমন কি রজক পর্য্যন্ত আমার পিসীমা কোথা হতে এক বুড়ো ব্যাটাকে বাহাল করেছেন।

তেজচন্দ্র বলিল, "তাহ'লে যুবজনের পক্ষে তোমার বাড়ীটা forbidden place কি বলো, এক তুমি ছাড়া।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল—কতকটা তাই।

একজন আর্টিষ্টিক বন্ধু তার মেজাজটা কিছু দরিয়া কছমের ছিল, সে অন্যসুরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "এ একবারে অন্যায় কিন্তু, মেয়েদের নারীত্বকে এতে স্পষ্ট অপমান করা হয়। কারো ছোঁয়াচ না লাগে, কারো পরশ না বাজে—যেন অত্যন্ত ঠুনকো জিনিষ, এ রকম সাবধানে নারীত্বকে বজায় করার চাইতে নারীত্বের অপহ্নব ঘটাতেও আমি দুঃখিত নই।

বৃন্দাবন তাহার পৃষ্ঠে হাত চাপড়াইয়া বলিল, না-হে ভায়া তাঁর

স্বাধীনতায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী আমি নই। থিয়েটারে বায়স্কোপে কবে না যাচ্ছেন, আমার পিসীমাকে শুদ্ধ বলা আছে তিনিও এ সব মেয়েদের হালচাল বুঝে নিয়েছেন।" বৃন্দাবন যখন বলিতে আরম্ভ করিত তখন বেরাপোয়া বলিয়া চলিত, কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার আবশ্যক বোধ করিত না, তার কারণ প্রাণটা তাহার বড়ই সাদা ছিল।

এই সাদা হওয়াটাই যে তাহার ফ্যাসাদের কারণ হইয়াছিল সে কথা পরে বলিব।

ঘরের আড্ডা ছাড়িয়া বাহিরে গঙ্গার ধারে যখন আড্ডা আরম্ভ করিল, তখন একদিন ভারি একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সবাই এক এক ডোজ টানিয়া পানসীটীতে সবে বসিয়াছে, এবং আর্টিষ্টিক বাঁশিটিতে তাহার একটী তান চড়াইয়াছে। এমন সময় একজন কে সন্ন্যাসী "ওঁ মহামায়ে" বলিয়া নৌকার উপরে আরোহণ করিয়া বসিল, সন্ন্যাসীর বাবরী কাটা চুল, চেরা সিঁথি, গায়ে গেরুয়া আলখেল্লা—বয়সও বেশী বলিয়া বোধ হয় না। দেখিলে যে খুব বড়দরের একজন সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয় তাও না—তবে চোখ দুটাতে একপ্রকার অস্বাভাবিক দীপ্তি আছে।

"চালাও পানসী" বলিয়া সন্ন্যাসী চিম্‌টাটা পাটাতনের উপর রাখিয়া সটান বসিয়া পড়িল।

তেজচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সাধুর আস্তানা কোথায় বটে মহারাজ।"

সন্ন্যাসী কিছুমাত্র ভূমিকা না ফাঁদিয়া তাহার যা পরিচয় দিয়া গেল। সংক্ষেপে এইরূপ, সে তারাপীঠের এক সাধু, সম্প্রতি সাগর সঙ্গমের মেলায় যাইবে বলিয়া আসিয়াছে, এখন সে কিঞ্চিত কারণের প্রার্থী।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "কারণ যে আমাদের কাছে আছে তা কেমন করে জানলেন প্রভু?—"

সন্ন্যাসী একটা হুঙ্কার দিয়া বলিল, আরে ব্যাটা লুকোচুরি করবার জায়গা আর পেলিনে, তোদের কাছে না থাকলে মা আমায় তোদের দোরে পাঠায়? নে ঢাল।—বলিয়া খানিক একদৃষ্টে বৃন্দাবনের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, তুই ত ব্যাটা দেখছি মায়ের একটা মস্ত দেওয়ান রে—কপালে তোর রাজদণ্ড।

স্রেপ জ্যোৎস্না ও হ্যারিকেনের আলোকে কপালে যে কেমন করিয়া রাজদণ্ড দেখা যায়—এই লইয়া আর্টিষ্টিক অমলচন্দ্র তর্ক তুলিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল কাহারও তখন সন্ন্যাসীর কথায় প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক বিবেচনা নাই, উপরন্তু রাজদণ্ডটার পানে সবারই মেরুদণ্ড খাড়া হইয়া উঠিয়াছে তখন সে বাঁশী ছাড়িয়া বাহিরেই দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন নিজের হাতে একটা পাইট খুলিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে ধরিয়া দিল। সন্ন্যাসী একবার পৈতাটা বোতলে ছোঁয়াইয়া মিনিট খানেক মাত্র জপ করিয়া তারপর এমন চোঁ-চোঁ টান দিল এক নিমিষে বোতলটা খালি হইয়া গেল।

সকলে অবাক, ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার ধারণা ছিল তাহার জুড়ি নেই, কিন্তু পরাভব স্বীকার করিতে হইল, বৃন্দাবন ভক্তিতে গদ গদ হইয়া বলিল, "আপনি অমানুষিক শক্তির অধিকারী আপনি পায়ের ধুলা দিন।"

তেজচন্দ্রও সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এক সঙ্গে কতটি বোতল পার করিতে পারেন?"

উত্তর হইল, "মার হুকুম আছে পাঁচ বোতল, কিন্তু আমি সাত বোতল পর্য্যন্ত চালাইতে পারি।"

অমল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "থাক প্রভু—ঐ এক বোতলেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে এর পর আমাদের শুদ্ধ না টান ধরান!"

সন্ন্যাসী তীব্র একটা ভ্রুকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, বৃন্দাবন অমলচন্দ্রকে তাহার জিহ্বা সংযত করিতে বলিল। অমল এতটুকু হইয়া গেল, সন্ন্যাসী তখন দেশে ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কিরূপ অধোগতি হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার এক ইতিহাস বলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে জাগাইতে পুনরায় যে ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন তাহা উচ্চ কণ্ঠেই ঘোষণা করিলেন। পাকে-প্রকারে এই কথাটাই বারম্বার উঠিতে লাগিল, তাঁহারাই কয়জন অঘোরপন্থী দলের ব্রাহ্মণ সাধু সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতে দুর্গম তপারণ্য ছাড়িয়া এই জনারণ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নৌকারোহী সকলে ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই জন্য ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুঅভ্যুত্থানের কথায় সকলেই বেশ একটু উত্তেজনা অনুভব করিলেন, তাহার উপর শিরায় শিরায় কৃত্রিম উত্তেজনার স্রোতও যাই হোক একটু বহিতেছিল।

রস বঞ্চিত অমল কিন্তু থাকিতে না পারিয়া বলিল, কিন্তু সন্ন্যাসী বাবা আপনাকে আমার একটু নিবেদন করবার আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুভ্যুদয়ে যে আপনারা নিরালয় ছেড়ে লোকালয়ে এসেছেন এ বেশ কথা। কিন্তু সে অভ্যুত্থান ঘটবে কি এই পাট পাট কারণ রস উদরীধ্যানে—

সন্ন্যাসীর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। একটা দুর্ব্বোধ্য হিন্দী বয়েৎ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "বেতমিজ, তুই কি জানিসনে ব্রাহ্মণ যে সুরা স্পর্শ করে সে সুরার সুরাত্ব থাকে না—সে যে সুধা হয়ে যায়রে মহামূর্খ! দেখলি নে—আমি মাকে ডেকে শোধন করে নিলাম।

অমল আবার কি তর্ক তুলিতে যাইতেছিল বৃন্দাবন বাধা দিয়া বলিল, "ওর কথায় রাগ করবেন না প্রভু। আপনার চোখের দিকে চাইলেই জানা যায় যে আপনি এই অধমদের জন্যই এসেছেন।"

সন্ন্যাসী তেমনি তীব্রোজ্জ্বল নেত্রে বলিতে লাগিলেন, আজকাল অনেকেই সেই তর্ক করে দেখতে পাই। তোমরা কি মনে করো ব্রাহ্মণের সে তেজ আর নাই ? তারা এখনো মরা গাছে শুদ্ধমাত্র কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে ফুল ফোটাতে পারে—ভারি একটা ক্লেদ জমে উঠেছে কিন্তু সে তপস্যা করে আঁধার দেশে আলোর বন্যা নিয়ে আসবে। ব্রাহ্মণ! চির কালই ব্রাহ্মণ! চিরকাল সে সব বর্ণের উপরে—তাতে কোন মালিন্য স্পর্শই করতে পারে না। সে সূর্য্যস্বরূপ স্বয়ম্ভু! আদি বীজমন্ত্র! বেদ তার ওষ্ঠ প্রান্তে, স্বয়ং সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে মাথায় রেখে দিয়েছে। ওঁ নমো ব্রহ্ম রূপায় নমো। নমঃ ব্রাহ্মণায় নমঃ—ওঁ স্বস্তি—"

এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া নৌকা হইতে অবরোহণ করিলেন, নৌকারোহী ব্রাহ্মণগুলি এই মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। ভারি একটা ঝাঁঝালো রকম উন্মাদনা তাহাদেরও পাইয়া বসিয়াছিল, এতদিন শুনিয়া আসিতেছিল ব্রাহ্মণ লোভী, ব্রাহ্মণের পতনেই ভারতের পতন হইয়াছে, আজ তাহাদের সমস্ত জড়তা ও কুণ্ঠার উপরে এই সন্ন্যাসীর বাণী যেন অভ্যুদয়ের জলদ মন্ত্র পড়িয়া দিয়া গেল।

তাহারা শ্মশান পর্য্যন্ত যেখানে সন্ন্যাসীর আস্তানা পড়িয়া ছিল সেখান পর্য্যন্ত তিন ব্রাহ্মণে ছুটিল। শ্মশানে একটা মড়া পুড়িতেছিল, সন্ন্যাসী সেই মৃতদেহের চিতার সামনেটায় একখানা মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া জপে বসিয়া গেলেন। বৃন্দাবনদের তিনজনকেই বলিলেন, "আবার সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিয়ো!"—

শ্মশানের লোকে বলিল, "সন্ন্যাসীটি ভারি অদ্ভুত সন্ন্যাসী, শবমাংস পর্য্যন্ত অনেকে আহার করিতে দেখিয়াছে, কুকুর শৃগালের সহিত একপাতে ভোজন করে।

সকলের ভক্তির মাত্রা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শুধু নৌকার উপরে

আনমনা অমল সেই কেমন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার মনটা বেসুরা বলিতে লাগিল। কাহাকে খুলিয়া বলিবার তাহার কিছু ছিল না কিন্তু এই কথাটাই কেবল বার বার তাহার মনে আসিতেছিল মানুষ অতি সহজে কেমন মিথ্যা অলৌকিকে আত্ম-প্রবঞ্চনা করে।—বাজীকরের মতো কেমন সহজে কুসংস্কার বিমুক্ত শিক্ষিত মনকেও বশীভূত করিয়া ফেলে।—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিনে কাজকর্ম্মের চাপে ক্ষেত্রনাথ তেজচন্দ্র তাহারা প্রায় সকলে সন্ন্যাসীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, শুধু বৃন্দাবন চন্দ্রেরই মনটা বাঁধা পড়িয়াছিল সন্ন্যাসীর পেছনে—তাই দেখা গেল আদালত হইতে আসিয়া হাত মুখ না ধুইয়াই কাপড়খানি মাত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর আস্তানার দিকে যাত্রা করিল। তাহাব কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল দেশ যথেষ্ট প্রবৃত্তি মার্গে রাশ ছাড়িয়া ছিল এইবার তার নিবৃত্তি মার্গের প্রয়োজন হইয়াছে। সন্ন্যাসী সেই নিবৃত্তি মার্গেরই বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের কথাটাও তাহার কানের কাছে অহোরাত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। নিজেরা গায়ত্রী মন্ত্র পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল একজন যে কেহ আসিয়া তাহাদের সমস্ত মালিন্যের উপরে আলোক পাত করিয়া যাউক। মৃতদেহে নবপ্রাণ ফিরিয়া আসুক।

অনেকখানি আশা লইয়া বৃন্দাবনচন্দ্র বাহির হইয়াছিল। বহুদিন

অবিশ্রাম ভোগের পর একটা ক্লান্তি অবসাদও তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সেটাও সময় কালে ঘাড়ের উপর ভর করিতে বাদ দিল না। জড়ের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া নবজন্মের দিকে হিন্দু অনন্ত আশা লইয়া আবার ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিবে, নূতন হিন্দুত্বের এই আধ্যাত্মিক ভরসার দিকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন যেন ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল।

সন্ন্যাসীকে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া শ্মশানের মধ্যেই এক ধারে আপনার ঠাঁই করিয়া লইল, দেখা গেল ইতিমধ্যে আগত অনেক গুলি ভক্ত সেখানে সমবেত হইয়াছেন।

সন্ন্যাসী বৃন্দাবনকে দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি শুধু আজ কারণ রসের ভিখারী হইয়াই আসেন নাই। নিজের পুঁজি যদিও কম ছিল গুরুর নাম লইয়া তবু একবার বাহিয়া-চাহিয়া দেখিবার কল্পনাটাও ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হাত ইশারায় ডাকিয়া বলিলেন, "বৈঠেরে ব্যাটা।"

বৃন্দাবন আগে হইতে বসিয়াই ছিল। উপস্থিত আর একটু সুরিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর কাছটাতে বসিল সন্ন্যাসী তখন উপস্থিত জন-সাধারণকে বৃন্দাবনের পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি একজন মহাপুরুষ, কপালের রাজদণ্ডই তার চিহ্ন।

বৃন্দাবন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় দাঁড়াইলেও চেহারাটা তখনও তাহার বেশ রাজসই গোছের ছিল। ভোগে থাকিলে যে রকম চেহারাটা খোলে প্রায় কতকটা সেইরূপ। সাধারণে বুঝিল বড় লোকের ঘরের কোন ননীগোপাল হইবেন। তাহারাও একটু সম্মান দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিলেন এঁর মনের কল্পনাটা আমি চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ইনি চান বাঙলাদেশে আবার ব্রাহ্মণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। কেমন বাবা তাই নয় কি?

বৃন্দাবন ভক্তিগদগদ নেত্রে 'হাঁ প্রভু তাই' বলিয়া কথাটা মানিয়া লইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, তা পারবে, গুরুর নাম নিয়ে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্চি একবার দেখিয়ে দাও যে ব্রাহ্মণ মরে নি, তার দর্প দম্ভ সব আছে। অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করিয়ে দাও। তোমরা হাল ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছ বলেই ত আজ কতদিকে কতজনে সমাজের বুকের উপর কত কি করে যাচ্চে!—আপনার তেজে থাকো। জপ করো আমি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

যেটা আসল কথা সেটা সন্ন্যাসীর মুখে বাকী থাকিয়া গেলেও বৃন্দাবন নিজের ভিতর হইতে সে পুরণটা করিয়া লইল। সে বেশ জানিয়া রাখিয়াছিল দেশে ব্রাহ্মণের প্রভাব যদি কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা ত্যাগের ভিতর দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আবার তাঁহাকে চাণক্যের মত দণ্ড কমণ্ডলুধারী হইয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতে হইবে কিন্তু রাজ্যের খবর সমস্ত লইতে হইবে, শুধু আধ্যাত্মিক হরি-নামামৃত রসাস্বাদনে দেশের মন আর ভরিবে না। এমন একটা বিষয়ে হাত দিতে হইবে অন্তর বাহির দুয়ের ক্ষুধা তাহাতে মিটিবে।

বৃন্দাবন উঠিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিল—আরে ব্যাটা তুই এখনো তুষ্ট হ'তে পারিস নি। কিন্তু ছাখ, তোকে এখনো সে ত্যাগের মন্ত্র হাতে তুলে দিতে পাচ্চি না। তোর এখনো স্ত্রী কন্যা রয়েছে, তাদের একটা বন্দোবস্ত কর্ তারপর ত্যাগের মন্ত্র নিবি।

আবার দ্বিগুণ ভক্তিতে বৃন্দাবনের সমস্ত অন্তরাত্মা প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের কথাগুলি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দেওয়াতে সে যেন আঁধারে একটা কূল পাইল। নিজের মনকেই বলিল, আমি যে,

বলিতেছিলাম মহাপুরুষ সত্য কি না তার প্রত্যক্ষ করো। আর কোন দ্বিধা সঙ্কোচ রহিল না।

অনেকখানি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, যারে ব্যাটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আয়গে তারপর তারাপীঠে আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। ওঃ মেয়ে ত নয় রে সাক্ষাৎ গৌরী—মা কুমারী আমি তোকে প্রণাম করি—

মিনিট খানেক ধ্যানস্থ হইয়া সন্ন্যাসী যেন কাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় দেখিয়া সন্ন্যাসীই বৃন্দাবনকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। বৃন্দাবন কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া বসিয়াছিল। সে অন্তরের মধ্যে কত সহস্র বৎসর আগেকার যুগের তপোবনবাসীদের আধ্যাত্ম্য তেজের প্রভাব নিজের শিরায় শিরায় অনুভব করিয়া লইতেছিল। আর ভাবিতেছিল সেই রক্তধারা যদি আমার শিরায় প্রবাহিত হয় তবে তুচ্ছ জড়ের পাশে কেন আবদ্ধ হই? এই আমার আমিত্বটাকে যে কেবল আমি আমি লইয়াই আছে, "আমার টাকা" "আমার মেয়ে" "আমার স্ত্রী" আরও কত কি যে আমার তার লেখা জোখা নাই।—সেটা বলি দেওয়া কি এতই দুরূহ?

ভয়ানক রকম একটা উদাস ভাব তাহাকে পাইয়া বসিল—সন্ন্যাসী আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আরে বেটা যেদিন সত্যিই সত্যকার আলোক তোর প্রাণে প্রবেশ করবে সেদিন কি আর বিচার করতে সময় পাবি? পাথর ফুঁড়ে যেমন ঝর্ণা বেরিয়ে পড়ে তেমনি বেড়িয়ে পড়তে হবে।

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।...ওঁ মা...

বৃন্দাবন প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, মদের বোতল সঙ্গেই লইয়া গিয়াছিল সেটা সন্ন্যাসীকে দিয়া আসিতে ভুল করিল না।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বন্ধুরা প্রায় সকলেই ফিরিয়া গিয়াছিল শুধু ক্ষেত্রনাথ সেইখানে ধন্না দিয়া বসিয়াছিল—ক্ষেত্রনাথ দেখিল বাবুর মুখ বিশুষ্ক, চিন্তাকাতর—সে মদের বোতল বাহির করিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে বৃন্দাবন তাহাকে হাত নাড়িয়া বারণ করিয়া বলিল—এর চাইতে বড় মদ টেনে আসা গেছে ক্ষেত্রনাথ, যত খাও নেশা ছুটবে না।

ক্ষেত্রনাথ হেঁয়ালীর অর্থভেদ করিতে না পারিয়া গো-গ্রাসে একাই খানিকটা আগে গলায় ঢালিয়া লইল। বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আরও খাও! তবু আশ মিটবে না। ক্ষেত্রনাথ সাধাসাধি করিয়া বলিল আপনি খাবেন কি না বলুন, সে হতেই পারে না। ভদ্র-সমাজে মিশবেন কি করে?

বৃন্দাবন বলিল, "হয়ত দেখ তোমার ভদ্র সমাজই বা ছাড়তে হয়।...

ক্ষেত্রনাথেরও শঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল, ভাবিল তাইত, এ যে আবল-তাবল বকে! তাহার বিশেষ ধারণা হইল, সেই সন্ন্যাসী বেটার কাণ্ড।

অনেক দিনের পর বৃন্দাবন সন্ধ্যা আহ্নিকে বসিল। ক্ষেত্রনাথ ইত্যবসরে অন্দর মহলে দেবীর দরবারে খবরটাও পৌছাইয়া দিল।

একটা কি আত্মীয়তার সুবাদ ছিল বলিয়া ক্ষেত্রনাথ বাড়ীর মধ্যে কখনো কখনো যাইবার ছাড়পত্র পাইয়াছিল, তাহা ছাড়া ক্ষেত্রনাথ অমিতাকে মা বলিয়াই ডাকিত।

ক্ষেত্রনাথ খুব সন্তর্পণে সংক্ষেপে আজকালের ঘটনাটা বিবৃত করিয়া বলিল, "খুব সাবধান মা বাবুর মাথার গোলমাল ঘটবার সম্ভাবনা।

অমিতা গুম খাইয়া ক্ষেত্রনাথের কথাগুলা কেবল শুনিয়াই গেল

কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিল না।—স্বামী সন্ন্যাসীর কাছ হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন আহ্নিকে বসিয়াছেন। অমিতা ভাবিল কিছু নয়—তাহাকেই অপমান করিবার জন্য স্বামী দেবতার এই নব আয়োজন। মুখের কথায় কিছু বলিবেন না কেবল ভাবে ভঙ্গিমার চাবুক উঠাইয়া চলিবেন—বেশ যদি আরম্ভই হইয়াছে তবে—ভাল করিয়াই হউক।

ক্ষেত্রনাথের প্রতি আদেশ হইল সে যেন কালই আপিস যাইবার পথে তাহার দাদার অপিসেও একবার দেখা দিয়া দাদাকে তাহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইতে বলে। ক্ষেত্রনাথ যে আজ্ঞা বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইল।

অমিতা ইবসেনের একখানা নভেল লইয়া পড়িতেছিল। নভেলখানা বিছানায় রাখিয়া আস্তে আস্তে পা টিপি টিপি করিয়া—বাহিরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল স্বামী তাহার তখনও তদ্গতচিত্তেই সন্ধ্যা উপাসনায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। আশে পাশে কেহ আসিল, কি, গেল সেদিকে তাঁহার মোটে দৃষ্টি নাই। যেন মূর্ত্তিমান ধ্যানী বুদ্ধ! অমিতার কেমন রাগ হইতে লাগিল, গৃহের মধ্যে সে এমন যুবতী স্ত্রী; কত তার রূপ! কত তার মাধুর্য্য সেদিকে লক্ষ্য নাই, রাজপুত্র আমার পরমার্থ তত্ত্বে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন।

তরুণী অমিতা যখন পা টিপিয়া টিপিয়া আবার আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল—তাহার মনে হইতে লাগিল, অন্ধকার গলির চারি পাশ হইতে যৌবনের দেবতারা যেন অমিতাকে জড়াইয়া একটা কান্না জুড়িয়া দিল—কিসের জন্য তবে তাহারা এই অমিতাটিকে এত বিচিত্র মহান অপরূপময়ী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল? সে যে ছিল শুধু একটা স্বপ্ন···নীল সাগরের বুকের মানিক! কণ্ঠে তার বনপথের উদাস করা বাঁশী—চক্ষে তার কাজল মেঘের বিদ্যুৎ—ওরে কল্প লোকের আলোক

লতা...শুধু তাপসের পূজামন্দিরে পূজারিণী হইবার জন্যই তুই সৃষ্ট হইয়াছিলি? এযে অসবম্ভব কল্পনা। তা নয়—তুই যা—তোকে সেই রূপেই পাইতে চাই!...

নিশিথ রাতের পাপিয়া যেমন প্রাণ খুলিয়া আপনার সমস্ত সঙ্গীতকে নিঃশেষে নীল-অজানায় ছাড়িয়া দেয়—অমিতাও সেইরূপ নিজের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাকে বাধাহীন গতিতে ছাড়িয়া দিল। একটা দর্পের ও দম্ভের প্রচণ্ডতার মধ্যে অমিতা কতকটা যেন তবু হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিদ্ধেশ্বর বাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "অমিতা"—অমিতা জানালার ধারে একখানা চেয়ারে বসিয়া ছুঁচ সুতা লইয়া একটা গলা-বন্ধ বুনিয়া যাইতেছিল; দেহের উপরার্দ্ধ প্রায় অনাবৃত ছিল, নিম্ন অর্দ্ধ কিন্তু মোটা একটা র‍্যাগে ঢাকা ছিল।

সিদ্ধেশ্বর বাবুর কণ্ঠস্বর পাইয়াই অমিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ঝিও উপরে উঠিয়া আসিতে ছিল, অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এসেছেন কি?"

ঝি বলিল, "হাঁ মা।"

"দাদার সঙ্গে আর কেউ যদি না থাকে, তবে দাদাকে এই খানেই আসতে বলো।"

"ঝি আর কেহ নাই" বলিয়া দাদা সিদ্ধেশ্বর বাবুকে ডাকিয়া দিতে

গেল। অমিতা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল বৃদ্ধা পিসিমাতা এখন উপরের কোন ঘরে আছেন কি না—নীচের শব্দে বোঝা গেল তিনি এখনও কলতলাতে বাসন, থালা, কোসাকুসী লইয়া তাহাদের সমার্জ্জনায় প্রাণপণ আয়োজনে লাগিয়া রহিয়াছেন। ঘসিয়া মাজিয়া যেমন করিয়া হউক জড়পদার্থের মধ্য হইতেও শুচিতা বাহির করা তাঁর চাই।

অমিতা গায়ের কাপড় চোপর ঠিক করিয়া পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া দাদার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর সিঁড়িতে হাতের মোটা রূপা বাঁধান লাঠিগাছটা ঠুকিতে ঠুকিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমায় তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে অমিতা?"

অমিতা মুখখনি নীচু করিয়া বলিল, "হাঁ দাদা।"

—"কেন?"

ভগ্নীর এ ছায়াচ্ছন্ন মুখের কাতরতাটা ভাল বলিয়া ঠেকিল না। একেই তিনি বিবাহ দিয়া অবধি পস্তাইতেছিলেন, প্রায়ই শুনিতেছিলেন,—অমিতার মত লেখাপড়া জানা মেয়ের মর্জ্জাদা রক্ষা করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান জামাই বৃন্দাবনের নাই। তাহার উপর ওকালতির আয়ও সামান্য—এত দিনের পর নানারকম চেষ্টায় থিয়েটার রোডের বাড়ীখানি মাত্র করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেও প্রায় অমিতার অনেকগুলি টাকার জুয়েলারী বাঁধা পড়িয়াছে। চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া আর একবার উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি বল্ দেখি?"

অমিতা তথাপি নিরুত্তর রহিল।

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "আমার কাছে তোর লুকোবার কি আছে অমিতা? আমি তোর বড় দাদা—পিতৃতুল্য! বৃন্দাবনটা কি আবার নিজমূর্ত্তি ধরেছে? আমি এসে দেখেছি যে রকম তার সঙ্গীর দল, একটা বড়

দরের উকীল সে কি না মিশে বেড়ায়, যত রাজ্যের বখাটে আকাট, তাদের সঙ্গে—কেউ আর্টিষ্ট, কেউ পোয়েট, কারো ঘরে ভাত নেই, কেউ লর্ড বেকার—ছ্যাঃ এত ক'রে বলেও ত পারলুম না।"

অমিতা হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "না দাদা তা নয়, ভারি এক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি।"

সিদ্ধেশ্বর তেম্নি উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কি বল্ দেখি!"

অমিতা বলিল, "উনি কতকটা স্পেসিমিষ্ট বা Back to Dark Age মতাবলম্বী হ'যে পড়েছেন। বাহির বাড়ীতে আমাদের জন্য Special খাবার তৈরী করবার জন্য একটা মগ Boy ছিল, সেটাকে ত আজ তিন দিন হ'লো জবাব দিয়ে দিয়েছেন, কোন প্রকার মাংসের আমদানী হোতে পারবে না তা স্পষ্টই প্রচার ক'রে দিয়েছেন। সে যাই হোক মরুকগে—নিরামিস খেয়েই এক সন্ধ্যে একবেলা কাটানো গেল।—কিন্তু মেয়েকেও মিশন স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে সরস্বতী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দেওয়াটা—আমি ত এর কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে দাদা। ওঁয়ার বন্ধু বান্ধবেরা নাকি বলছে—উনি দেশে নূতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচার করবেন। সত্য-মিথ্যের খবর ঠিক জানিনে—তবে একটা সাধু তাঁর সঙ্গ নিয়েছে, তার খবর পেয়েছি।"

সিদ্ধেশ্বরের চক্ষু ক্রমেই এক ডিগ্রী করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছিল, অমিতার কথা যখন শেষ হইল তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার বিস্ময়ের প্রভাবটা কাটিল না। অনেক ক্ষণের পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বল্প প্রায় মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "দোষ কারও নেই অমিতা, দোষ আমাদেরি অদৃষ্টের। তখন একধার হ'তে আমাদের আত্মীয় স্বজন এ পাত্রে বিবাহ দেবার কথা বারণ ক'রেছিল, আমিই ঝোঁক ক'রে দিয়েছিলাম। মা ত

বিবাহের তিন দিন আহার নিদ্রা ছেড়ে দিযেছিলেন, আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল—অমি এখানে ভালবাসা পাবে, আর ভাত কাপড়ের কষ্ট পাবে না। দেশও যাই হোক একটা আছে, কিন্তু পরে যথেষ্ট পস্তিয়েছি; জানি সে একজন weack mindএর লোক, শেষ-কালটায় কিনা একটা সন্ন্যাসীতে তাকে পেয়ে বসলো। বৃন্দাবনের ঠাকুর্দ্দা ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে উন্মাদ হ'য়ে বেড়িয়ে প'ড়েছিল···রক্তের দোষ যাবে কোথায়? এখন কেউ কোন কথা বলতে গেলে—কাণে করেনা কেমন?"

অমিতা বলিল, "কাণে করা ছেড়ে এ কয়দিনের মধ্যে একবার আমার সঙ্গে কথা কয়েছে? পিসী বুড়ী এতে ভারি খুসী, আমার প্রতি অবজ্ঞার জন্যও বটে, আর নতুন হিঁদুয়ানীর জন্যও বটে। তুমি ত জানই দাদা—বুড়ীটা কি রকম ক্রুট! একটি দিন দেখলুম না যে আমার কুৎসা না ক'রে জল খেয়েছে, এখন আবার তাতে ভাইপোর মতি বিপর্য্যয়···একে মা মনসা তাতে ধূনার গন্ধ—আর যায় কোথা? মেয়েটাকে পর্য্যন্ত মাঝের ঘরে উঠ্‌তে দেয়নি! "ছুঁবি ছুঁবি!" পূজোর ঘর···এতটা ছুঁৎ-মার্গ দাদা, যে আমার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করচে।"

শেষের দিকটায় খানিকটা অমিতার চোখের জলও কথার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। সিদ্ধেশ্বর খানিক গুম হইয়া ভাবিয়া বলিলেন, "এর এক উপায় দেখছি এ বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে যাওয়া।—চুণবালির কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, কেবল ইলেকট্রিক বসাতে বাকী। আচ্ছা কাল আমি আসবো—এখন দিন কতক না হয় আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌বি। তবু না—বাস্তবিক এ অত্যাচার।"

তাহার পর শিক্ষিত লোকের কুসংস্কার লইয়া অনেক খানি টীকা

টিপ্পনীর প্রয়োগ চলিতে লাগিল, সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এই দেশে একবারে ছ্যা ছ্যা হয়ে গেছে—ব্রাহ্মণের নাম করলে যেখানকার আচণ্ডাল মানুষের একটা তীব্র জ্বালা স্পষ্ট ফুটে বেড়িয়ে পড়ে—সেখানে উনি এই বস্তা-পচা পুরাণো ধর্ম্মটাকে জাহির ক'রে তুলবেন? বামুনের আর আছে কি? সাধারণের মত তুইও যখন সমান লোভী, সমান অর্থ পিশাচ—তখন মিছে বরাইয়ে কি ফল পাবি শুনি?"

অমিতাও সায়ে সায় দিয়া বলিল, "কিছু না দাদা বুদ্ধির বিকৃতি, এই বিকৃত বুদ্ধির ফল, কুসংস্কার! আর এই কুসংস্কারে যখন সারাটা দেশ আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে—তখন নতুন ক'রে মিথ্যের জাল বোনায় কি সার্থকতা?"

কথাবার্ত্তায় অমিতা তাহার দাদার কাছে এই কথাটাই প্রমাণ করিল স্বামীর তাহার বুদ্ধি বিকৃতিই ঘটিয়াছে, এবং এই বিকৃতির পরিণাম উন্মত্ততা!

সিদ্ধেশ্বরকে অনেক খানি ভাবাইয়া তুলিল। তিনি নিজেও একবার বৃন্দাবনের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে একবার বুঝিয়া লইবেন ঠিক করিলেন। সিদ্ধেশ্বর যখন বিদায় লইয়া বাহির হইলেন, তখন অমিতা কাঁদিয়া বলিল, "মাকেও এই খবর দেবে দাদা—যে তোমার আদরের দুলালীর কি নাকালটাই না হচ্ছে!"

ভগিনীর মনঃপীড়ায় সিদ্ধেশ্বরের চিত্তটা ভারি তিক্তস্বাদে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি উপায় হাতরাইতে লাগিলেন।

সিদ্ধেশ্বর চলিয়া গেলে অমিতাও একবার বাহিরের বারান্দাটায় দাঁড়াইল। যতদূর দেখা যায়—রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নাই। আপিস ফেরৎ বাবু, কুলী, আপনার আপনার গৃহে নিজের স্ত্রীপুত্রদের

কাছে—দিনমান খাটিয়া যাহা জুটিয়াছে তাই লইয়া হাসিমুখে ছুটিয়াছে, তাহারাও প্রিয় সমাগমের আশায় উৎসুক হইয়া আছে,—বাড়ীতে প্রিয়জনের পা'টি পড়িলেই উৎফুল্ল হইয়া আনন্দ অভিনয়ের উদ্যোগ করিবে। রাস্তার ও ফুটের তরুণীটি এইমাত্র তাহার মেয়েটীর ঘুম পাড়াইয়া হারমনিয়ম লইয়া বসিল। স্বামী তাহার কেমন এক আধটা বাদাম ডিস হইতে তুলিয়া মুখে দিতেছে, কখনও বা এক আধটা, ছুঁড়িয়া স্ত্রীর দিকে ফেলাইয়া দিতেছে। স্ত্রীও অপাঙ্গভরা চাহনিতে ঢলিয়া এই পৃথিবীতেই যে স্বর্গ তাহার প্রমাণ করিতেছে। ঘরখানি কি পরিষ্কার! বিছানার চাদরটিতে একটা নক্সা ঝুলাইয়া দিয়াছে, জানালার সার্সিতেও নক্সা, ফুল, আঁকিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাহাদের সাংসারিক আয় নিশ্চয় এ বাড়ীর আয় অপেক্ষা বেশী নয়। আসল কথা মনের মিল আছে, তাহারা দুই জনেই যে তরুণ-তরুণী।

—"মা—"

মেয়ে রেখা আসিয়া একেবারে পেছন দিক হইতে তাহার মায়ের গলাটা জড়াইয়া ধরিল। অমিতা শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন স্কুলে কেমন পড়া পড়লী রে?"

মেয়ে বলিল, "এই সাঁঝ বেলা পর্য্যন্ত থাকতে হ'ল মা—সেখানে সাঁঝ বেলায় সন্ধ্যাবন্দনা, দুর্গার শতনাম, শ্রীকৃষ্ণ সহস্রী এই সব শিখতে হবে। আমাদের একটা ক্লাসের মেয়ে ভারি একটা শুক-সারীর গল্প শিখে এসেছে, আমাদের শোনাচ্ছিল, তুমি একটু শুনবে? আমি একটু শিখেছি।

মায়ের অনুমতি না লইয়াই আরম্ভ করিয়া দিল।—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,
সারী বলে আমার রাধা ব্রজের জীবন।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়ায় শিখিপুচ্ছ আঁকা,
সারী বলে আমার রাধার নামটী তায় লেখা—

অমিতা প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রেখার হাতের বেষ্টনী ছাড়াইয়া আপনার ঘরের দিকে চলিয়া আসিল।

রেখা ভাবিল—মা তাহার রাগিয়াছে, এই কয়দিন হইতেই কারণে অকারণে মায়ের রাগ সে লক্ষ্য করিতেছিল। তাই তাহার বাড়ী আসিয়া চেষ্টাই ছিল কথায় বার্ত্তায় আনন্দে মাকে ভুলাইয়া রাখা—কিন্তু যতই সে আয়োজন করিতে যায় ততই ব্যর্থ হইয়া উঠে। পেছন পেছন আসিয়া করুণ স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল মা!—অমিতা মুখ ফিরাইয়াই বলিল, "আমায় আর মা ব'লে ডাকিসনি রেখা, তুই মরে যা—তোকে নিয়েই ত আমার যত দুর্গতি।"

ফ্যাল ফ্যাল্ নেত্রে মেয়ে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল, কোথায় মায়ের ব্যথায় সহানুভূতিতে ডাকিল—মা! মা বিনিময়ে বলিল, তুই ম'রে যা—তোকে নিয়েই যত আমার দুর্গতি।"

দুর্গতির সূত্রস্থানটা যতই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না—ততই ব্যাকুল হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। মা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "রেখা তুই মরবি? মরতে প্রস্তুত আছিস?" রেখা ভয় পাইল, করুণাশায় একান্ত অসহায় ভাবে তাহার মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমিতা আস্তে আস্তে আসিয়া মেয়ের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, তোর কোন দোষ নেই, তুই নিতান্ত অসহায়—কিন্তু আমার একটা কথা শুনবি?"

রেখা মায়ের আঁচলের কাপড়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "শুনবো মা, শুনবো—তুমি যা বলবে তাই শুনবো!"

অমিতা বলিল, "যদি তাই শুনিস, তবে কাল যখন তোদের স্কুলের গাড়ী আসবে—তখন হাঁকিয়ে দিবি, কিছুতে ও সরস্বতী-স্কুলে পড়তে যাবিনে কেমন?

রেখা বলিল, "কিছুতে না! তুমি যেখানে বারণ করবে—সেখানে আমি কিছুতে যাবো না।

অমিতা বলিল, "আবার সেই মিশন স্কুলে যাবি, সেখানে না হয় ভবানীপুরে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবো—তাই বলে তোর সর্ব্বনাশটা নিজের চোখে দাঁড়িয়ে ত দেখতে পারবো না, আজ যেন তোর বাপেরই বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটেছে।

রেখা খানিক পরে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বুদ্ধিভ্রংশ কাকে বলে মা?

অমিতা রেখাকে বলিল, "যাও সকল খবর নেবার এখনও সে বয়স তোমার হয় নি, খেয়ে-দেয়ে এসোগে, আমার কাছে তুমি আজ হ'তে পড়বে।

রেখা আস্তে আস্তে পাকের ঘরের দিকে নামিয়া গেল। অমিতা আবার আপনার ভাবনা লইয়া বসিল। ইবসেনের যে বইটা খোলা ফেলিয়া রাখিয়াছিল সেই বইটার পাতা উল্টিয়া একটা ছবি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ছবিটাতে এই দেখাইতেছিল—লম্পট স্বামী মাতাল হইয়া গৃহে নিরুপায় স্ত্রীর উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে, স্ত্রী বেচারী নিজের ভাগের রুটি পর্য্যন্ত না রাখিয়া যায় ফল-মূল স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য ধরিয়া দিতেছে, পরিণামে লভ্য কি না পদাঘাত! নিজে উপবাসী থাকিয়া স্বামীর দৈহিক সম্ভোগে পর্য্যন্ত বাধা দিল না, তবু প্রভাতে এই অবহেলার পদাঘাত। ভাগ্যে তাহার শৈশব-প্রণয়ী দরদী ছিল সেই তাহাকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইল।

বিবাহিত জীবনটাকেই কেমন অমিতার অভিশপ্ত জীবন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানুষের গড়া সমাজ-নীতির উপরে একটা মর্ম্মান্তি

ক্রোধ জাগিয়া উঠিল, পুনঃ পুনঃ আপনার মনেই এই কথাটা উঠা-পড়া করিতে লাগিল, এই অনাবশ্যক বিধি-নিষেধের বিপাকে মানুষের কি দুরবস্থাটাই না ঘটিতেছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমিতা যখন এই রকম গভীর সমাজ-তত্ত্বের মীমাংসায় সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, মা বড়দাদা বাবুর—সম্বন্ধী নরোত্তমবাবু আপনার সাক্ষাৎ চাইছেন।

অমিতা যেন শুনিতে পায় নাই এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সাক্ষাৎ চাইছেন তোদের বড় বাবু?

ঝি একমুখ হাসিয়া বলিল, "বাবু কেন হতে যাবেন মা, বাবুর ত এখনো শ্মশান থেকে ফিরে আসবার সময় হয়নি, ঐ আমাদের ভবানীপুরের—বড়দাদাবাবুর সম্বন্ধী নরোত্তম বাবু! তিনি যে দু একবার এ বাড়ীতে এসেছিলেন মা!···নতুন বাড়ীতে বিজলী-বাতি দেবার কি সব কথা-বার্ত্তা যে কয়ে গিয়েছিলেন।

অমিতা ধীরভাবে বলিল, "ওঃ বুঝেছি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার—নরোত্তম বাবু! নরোত্তম ঐ নামটা উচ্চারণ করিতেও তাহার কোন খান্‌টায় যেন অত্যন্ত বাজিতেছিল, কি একটা অতীত স্মৃতির তীব্র-মধুর তিক্ত রসের দুশ্ছেদ্য সম্পর্ক তাহার সহিত জড়ীভূত ছিল। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা উষ্ণ রক্তস্রোত বহিয়া গেল। তাহাকে এইখানে আনিবার হুকুম দিয়া ঘরে যে আর একটা ইলেট্রিক বাতি নিভান ছিল

তাহার সুইসটা টিপিয়া দিল, ঘরে দিনের মত উজ্জ্বল আলো খেলাইয়া গেল—অমিতাও তাড়াতাড়ি সাদা রংএর ব্লাউসটার পরে গোলাপী রংএর শালখানা ফেলিয়া আর একবার আয়নার সম্মুখটায় দাঁড়াইল। চুলগুলা যথা সম্ভব যত সত্বর যথাস্থানে তুলিয়া দিয়া একটু ফিট্‌ফাট হইয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিল। (যে এটিকেট এ পাড়ায় নাই বলিলেও চলে।)

জুতার উচ্চ শব্দ করিতে করিতে নরোত্তম গৃহে প্রবেশ করিল। নরোত্তমকে দেখিয়া কে চিনিবে যে তিনি একজন বাঙালী, আনকোরা সাহেব বলিয়াই ভ্রম জন্মায়—মাথার টুপি হইতে গায়ের ড্রেস এবং পায়ের জুতা খাস বিলাতের আমদানী, মোচজোড়াটাও ঐ সাহেবী ফ্যাসানে কপলিন ছাঁটে কাটা, ভাল একটা দামী চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল।

"Good evening" বলিয়া নরোত্তম ওরফে মিঃ এন সিং অমিতার স্বাস্থ্যের খবর লইল।

অমিতার মনে যাই থাক বহিরে এখন প্রচুর হাসি ও চকিত-চাহনি প্রয়োগ করিয়া পরিচিত সুহৃদের যথাযথ কথার উত্তর দিল—এবং বেশীর ভাগ বলিল, একটু চা আনাই, কেমন ?

এন সিং বলিল, চা ত খেয়েই এসেছি অমিতা, তবে আপনার হাতের যদি হয় বলিয়া একটু হাসি চাপিয়া বলিল, ততটা আপত্তির কারণও দেখি না, হাঁ বলছিলাম কি নতুন বাড়ীর—

"হাঁ পরে শুনছি" বলিয়া হাত ঈশারায় এন সিংহকে থামিতে বলিয়া ঝিকে একটা ডাক দিল—ঝি পাশের ঘরেই অপেক্ষা করিতেছিল—আহ্বান মাত্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি চাই মা ?

অমিতা হিন্দীতে বলিল, "জলদি দো পেয়ালা চা বানায়কে লে আও খুব আচ্ছি তরো, সমঝা—ঝি ঘাড় নাড়িয়া অন্তরালে এই হিন্দী কহিবার জন্য মুখ ভ্যাংচাইতে ভ্যাংচাইতে চলিয়া গেল।

অমিতা বলিল, "কি বলবো বলছিলেন হাঁ এইবার বলুন ত শুনি।"

মিঃ এন সিং বলিল, "লাইট অনেক রকমের পেতে পারা যায়, আপনারা হলেন আমাদের আপনার লোক। কম দরের ফিট্ করতে হুকুম দেবেন কি বেশী দরের, আমাদের আপিসের সাহেবটা বলছিল ল্যাম্প "ওসারাম" কিছু মডারেট রেটে পড়বে দেখা যায়। আমি বল্লুম আজ থাক, কাল নিট্ খবর নিয়ে এসে তবে বলবো। তাহ'লে ঐ মেকারেরই দিযে দেব কেমন ?

অমিতা হাসিয়া বলিল, "আপনাদের যা পছন্দ-সই হবে আমাদের তাতে অমত আছে ?'

এন সিংহও হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, তা বটে - তারপর এন সিংহ অমিতার স্বামীর খবর লইল, মেয়ের খবর লইল, স্বামীর স্বাস্থ্য এবং মেয়ের স্বাস্থ্যের খবর লইল,—অমিতাও যথানিয়মে তাহার কথার উত্তর দিয়া গেল। সাদা কথার সোজা উত্তরে দুই জনেই খুসী হইল। অমিতারও মনে হইল তাহার বুকের ভার যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। অতীত কালের বন্ধুদের শুধু কাছে পাইলেও কত সুখ···চা আসিল, অমিতা খানিকতক বিস্কুটের জন্য ধরিয়া পড়িল। নরোত্তম হাসিযা বলিল, "না রেখার মা তোমার এই শুধু চা-টুকুতে যা পাবো,···বিস্কুটের যোগ শুদ্ধ ঘটলে কোন দিন খেসারতের কথা যদি ওঠে, আমায় দেউলে হ'য়ে যেতে হবে।" অমিতা হাসিয়া বলিল, "শুধু এক কাপ চায়ের বিনিময়ে দেউলে হবেন ?

নরোত্তমও অমিতার হাসিতে হাসি যোগ করিয়া বলিল, ও-কথা বলো না অমিতা রুমের এক কবি দেওয়ানা লয়লার একটী গণ্ডের তিলের বিনিময়ে সমস্ত হিন্দুস্থানের বাদশাই হারতে রাজী ছিলেন।

অমিতা বলিল, কোথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের Twentieth century আর কোথায় dark ageএর রুম।"

নরোত্তম বলিল, "কালের ব্যবধান কিন্তু মনের ব্যবধানকে বেশী দূরে ছাপিয়ে যেতে পারে নি, তা স্বীকার করতেই হবে।

অমিতা হাসিতে লাগিল এই হাসির ফাঁকে ফাঁকে অতীত জীবনের একটা সুমধুর ঘটনা স্রোত ছায়াচিত্রের মত চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে সময় নরোত্তম বিলাত চলিয়া গেল তাই, নহিলে আজ হয়ত অমিতা···যাউক সে কথা মনে আনাও চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলা মাত্র। তখন তাহার বয়স নিতান্ত কাঁচা ছিল, ষোল ছাড়িয়া সবে সতেরয় পদার্পণ করিয়াছে, কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে—অকস্মাৎ কোথা হইতে শুষ্ক জীবনের পরে এক রাশি কালো মেঘের মত নরোত্তমকে দেখিতে পাইল। সে তখন এমন মধুর বাঁশি বাজাইতে পারিত, এমন সুন্দর গাহিতে পারিত, আপনি মন তাহার বাঁশির সুরে আর গানের তরঙ্গে কেমন উদাস হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় তাহার এক বিধবা দিদিও তাহাকে এই ওস্তাদটির কাছে বাঁশি শিখিতে বলিল, বাঁশি শিখিতে গেল বটে কিন্তু সে বাঁশির সুর তাহার শিরা উপশিরা গুলাকেই বিকল করিয়া তুলিল, তাহার সদ্য যৌবন উত্তপ্ত হৃদয় পুরুষের সঙ্গ সহচর্য্যে ও হাস্যে বিভ্রমে কেমন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল। কলঙ্কের রাজটীকার মত নরোত্তমের চুম্বন-চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া লইতে হইল··· তবু বুকের কথা এই দুজনে ছাড়া বাহিরের আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। প্রকাশ করিতে পারিলে হয় ত—

অমিতা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুকটি দিয়া বলিল, আপনার স্ত্রীও আপনার কাছটিতে রয়েছেন ত?

নরোত্তম পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "শুধু বাঁশিই বাজল,

গন্ধই পেলুম, মনে হল আসবে, কিন্তু দেবীর দর্শন আর মিল্‌লো না। তাই বিচ্ছেদটুকু নিয়েই দিব্য নিশ্চিন্তে ঘর করছি।”

অমিতা আর অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার বুকের ভিতরটাতে কেমন এক পাথরের ঘা বাজিতে লাগিল। এ রকমটার জন্য কিন্তু সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কাণ দুটা দিয়া একটা জ্বালা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ নীরবতাটাও অসহ্য, কোন গতিকে চোখ মুখ বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ব্যবসায়ের এত উপায়ের টাকা কেবল নিজের জন্যই খরচ করছেন? এ অন্যায় - ত!

নরোত্তম বলিল, “নেবার লোক যে খুজে পেলুম না অমিতা—

অমিতা বলিল, কিন্তু বিয়ে করা নিশ্চয় উচিত ছিল। যার আজ খেতে কালকের সংস্থান নেই, তার হয়ত বিয়ে করাটা ঠিক শোভা পায় না, কিন্তু আপনার মত লোকের—দাঁড়ান, আপনাদেব পাড়ায় একবার যাই ত—তারপর চেষ্টা চরিত্র ক'রে দেখা যাবে।

নরোত্তম বলিল, “তদ্দিনকে আমার অদৃশ্য-ময়ীর অন্য রকম আদেশ জারীও হ'তে পারে।”

অমিতা মুখ টিপিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল, অদৃশ্যময়ীটা কে শুনি?

নরোত্তমও কেন কেমন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল বলিল, “ঐ যে বল্লুম না শুধু বাঁশিই বাজল, পায়ের শব্দও পেলুম···বস্ ঐ পর্য্যন্ত! Queen of the dark chamber”

অমিতা হাসিয়া বলিল, আমার কিন্তু কেমন ঐ dark chamberএর রাণীর পরে ঈর্ষা জন্মাচ্ছে, একজন সেধে তার সর্ব্বস্ব নিয়ে পেছন পেছন ছুটে বেড়াচ্ছে—আর সে ধরা দিচ্চে না—

নরোত্তম হাসিয়া বলিল, ভারি মজার রহস্য অমিতা “Queen of the dark chamber”···

কথা বার্ত্তার তালে ঘড়ির কাঁটাও যে অনেক খানি তাল ফাঁক করিয়া ফেলিতেছিল সেদিকে কাহারও খেয়াল ছিল না। মাঝে মাত্র অমিতা রেখাকে পড়াইতে আসিবার জন্য বুড়া মাষ্টার আসিয়াছে কি না খবর লইয়াছিল, ঝি তাহাতে বলিয়া গিয়াছিল, মাষ্টার অনেকক্ষণ আসিয়া রেখাকে পড়াইতে বসিয়াছে।

নরোত্তম আরও একটা কি কথা বেশ ভঙ্গীর সহিতই বলিতে যাইতে ছিল। ঝি আসিয়া নিম্ন কণ্ঠে বলিয়া গেল "মা বাবু আসচেন"

বাবুর নাম শুনিয়া নরোত্তম কেমন থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু এক মিনিটেই আপনাকে সামলাইয়া পকেট হইতে হিসাবের কাগজটা বাহির করিয়া সেখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চুরুট ধরাইয়া নিশ্চিন্তে সেইটা ফুঁকিয়া যাইতে লাগিল। খোলাপাতা ইবসেনের বইখানাও সে সময় কাজে লাগিয়া গেল।

অমিতাও বড় টেবিলটার একধারে নরোত্তম হইতে অনেক খানি দূরে, গায়ে বেশ করিয়া শালখানাকে জড়াইয়া কাঁটা লইয়া সেলাই কার্য্য চালাইতে লাগিল। রাতের বেলাতেও তাহার হাতের আঙ্গুলগুলি এমন খেলাইতে লাগিল যেন রূপকথার যাদুকরী নিজেরই হাতে নিজ অদৃষ্টের জাল বুনিয়া যাইতেছে।

নরোত্তম অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল, আমার ইচ্ছে কচ্ছে তোমার হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে-স্পর্শে জালের ফাঁকে-ফাঁকে—আমাকেও আর একবার বুনে নেই।

অমিতা কথাটা শুনিয়াও শুনিল না, শুধু বিজয়িনীর দীপ্ত কটাক্ষে ঈষৎ- হাসিয়া মুখখানা অন্য দিকে ঘুরাইয়া লইল।

খালি পায়ে গরদের চাদর খানি মাত্র গায়ে—জড়াইয়া বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে সাহেবের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াই

তাহার দিল্‌টা চটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপরে তাহার পা নাচাইয়া চুরুট ফোঁকাটাকে কিছুতে বরদাস্ত করিতে পারিল না। চক্ষু লজ্জায় ফুটিয়া কিছু বলিল না যদিচ, কিন্তু ভাল রকম চিনিয়াও মুখের আলাপটা করিল না। অপমানটা বুঝিয়া লইতে নরোত্তমের তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না, কিন্তু সে অপমান হজম করিয়া লইয়া হাসিমুখেই বলিল, প্রেন্নাম হই বৃন্দাবন ঠাকুর মহাশয়, আজ এ অধীন কিঞ্চিৎ খোস খবর নিয়ে এসেছিল—খবরটা ব্রাহ্মনীকেই দিয়ে গেলুম, খবর পাবেন··· কিন্তু আপনি যে এভিলিউশন থিয়রী হতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে একবারে উল্টো ডিগ্‌বাজীতে রেভিলিউশানে নামবেন কে ভেবেছিল? এযে এক-বারে সাক্ষাৎ ঋষি যুগে গমন তা যাই বলুন অমিতা সুন্দরী, এই আমাদের সেকেলে ক্ষৌম্য কাসায় বস্ত্রে বেশ একটি নিষ্ঠাপূর্ণ শান্ত-শ্রী ছিল, আমারও শুদ্ধ সত্যি, সত্যি করে প্রণাম করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।—আপনার ও-বাড়ীর ইলেকট্রিকের হিসাবের ফর্দ্দটা ঠেবিলের ওপরেই রেখে গেলুম। আর এই বই খানা—

বৃন্দাবন বলিল, বই খানা ইচ্ছা করেন ত আপনি সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারেন, কারো তাতে কিছু মাত্র আপত্তি হবে না। স্বরটা এমন রুক্ষ ও শুষ্ক শোনাইল যে কোন ভদ্র লোকের কাণে সেটা শিষ্টাচারের প্রতিবাদ বলিয়াই ধরা পড়ে। তবু নরোত্তম বলিল—"বই খানা যে আমাব নয়।"

বৃন্দাবন তেমনি রুক্ষ স্বরে বলিল, না হলেও নিয়ে যেতে পারেন।

অগত্যা বইখানা হাতে করিয়াই নরোত্তমকে নামিতে হইল। টুপিটা যখন মাথায় দিয়া সাহেবী কেতায় নরোত্তম সিঁড়ি বাহিয়া চলিতে লাগিল—তখন বৃন্দাবনের মুখের ভঙ্গিমাতেই ঘৃণাটা স্পষ্ট জাজ্জল্য-মান হইয়া ফুটিয়া উঠিল। অমিতা সেটা ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু প্রতিবাদ

করিবার সাহসে কুলাইয়া উঠিতে পারিল না।—বৃন্দাবন কোনরূপ ভূমিকা না ফাঁদিয়া বলিল, আমি শুনেছি, তোমার বেশ এই সংসারটীর পরে আর আস্থা নেই; আস্থা না থাকবার প্রধান কারণ আমার মত পরিবর্ত্তন, তোমার দাদাকেও তারজন্য ডেকে নিয়ে এসে অনেক খানি অনুযোগ করে বলা হয়েচে। তিনিও আমার বাতুলতায় অনেক খানি হেসে গেছেন জানি; কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো অমিতা, আমি দেবতা নই, সামান্য মানুষ! আমারই ঘরে বসে, আমার বিরুদ্ধে বিনিয়ে বিনিয়ে নানা প্রকার কুৎসা প্রচার করা নিশ্চয় সুসঙ্গত নয়, এবং শোভনও নয়… বলিয়া চলিয়া গেল। আর এমন ভাবে গেল, কথার বারো আনা না প্রকাশ করিয়া বলিলেও ভঙ্গিমাতেই ভাবটা আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অমিতার এই সজ্জা—এই রূপ—তাহাকে যেন চাবুক মারিতে লাগিল।

এতদিন তাহার এই একটা ধারণা ছিল মনের ভিতরে—স্বামীর মনের ভাব যাই হউক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বাহিরে কদাচ তাহা ফুটিয়া বাহির হইবে না। কিন্তু ইহা যথেষ্ঠ অপমান! মুখোমুখী সওয়াল জবাবে একটা অর্থ করিতে পারা যায়, তাহার মানে সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু এই গুমোট দিনের প্রচণ্ডতার মত শুধু হল্‌কা ছড়াইয়া চলিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই পরম প্রীতি প্রদ নয়—তা যতই প্রিয়তমের কাছ হইতে বহিয়া আসুক না।

অমিতা গায়ের শালখানা খুলিয়া ফেলিয়া জানালার শাসিগুলা খুলিয়া দিল, বাহির হইতে একটা শীতল হাওয়া বহিয়া আসিতে লাগিল। জ্বালা জুড়াইবার মত তৃপ্তি তাহাতেও নাই। নীচে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল তাহার পিসীমা ও আরও কয়েকজন তাহার সম্বন্ধে চুপি চুপি কি বলিয়া যাইতেছে, কথাবার্ত্তার ফিস্ ফিস্ শব্দটুকু মাত্র কানে আসে, পুরা কথাটা শুনিতে পাইলে তবু তৃপ্তি আছে। সত্য মিথ্যা, যাই হোক ততটা আসিয়া যায় না। এ তা নয়, কল্পনায়, বাস্তবে—সম্ভাবনায় অসম্ভাবনায়

একটা মহামন্থন চলিতেছে—ইহার সবটুকু বিষ তাহাকে হজম করিতে হইবে।

তাহার বিরুদ্ধে আজ যে বাড়ীর ছোট বড় সবাই তাহাদের রসনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র রহিল না। আকাশে তৃতীয়ার চন্দ্র অস্ত যাইতেছিল, তাহারই ক্ষীণ রেখাটাকে লক্ষ্য করিয়া অমিতা বলিল, হায় চন্দ্রালোক তোমারই মত আমার ক্ষীণ দীপ্তি-টুকু আঁধারের পারে পথ হারাইয়াছে! আমার প্রিয়তম আমার পরে মুখ ফিরাইয়াছেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায় কোচোয়ান গাড়ী লইয়া হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবু অজয় পারের সোনাখালির টিকিট কিনিয়াছেন।

সোনাখালি কি এবং কোথায় তারাপীঠের কাছে কি না, এই লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে—ক্ষেত্রনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, তা নয় দেশের বাড়ীতে একটা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবেন, আর মেয়ের বিয়েও দেবেন দেশে এমন পর্য্যন্ত কারও কাছে বলেছেন। অবশ্য যদি উপযুক্ত পাত্র পান নইলে নয়। কার কাছে যে বলিয়াছেন ক্ষেত্রনাথ নামটা তাহার লইতে পারিল না, কিন্তু কথাটা একবারে খাঁটি—বাড়ীর চাকর নফর বলিল, না বাবু নিশ্চয় তারাপীঠে যাবেন এ আমার খুব ভাল রকম জানা কথা।

যেখানেই যান তিনি, অমিতা তাহার কোন খবর পায় নাই। কাল

সারা রাত্রি এক রকম বিনিদ্র হইয়া সে ঘরের কপাট খুলিয়া শুইয়াছিল, একবার আসিবারও সময় তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কেবল জপ তপ লইয়াই ছিলেন।

যদি জপ তপ লইয়া থাকিবেন এই বাসনাই ছিল, তাহা হইলে এই একটা নারীকে বিবাহ না করিলেও চলিত। আর জপ তপের জন্য কে কোন কালে স্ত্রীর সঙ্গ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া থাকে? অমিতার মন বলিল, কিছু নয় তাহার নারীত্বটাকে অপমান করিবার জন্য স্বামী দেবতার এই নূতন প্রকার আয়োজন। তাহারা যে পুরুষ—তাহাদের সব শোভা পায়। পায়ে ধরা দাসীর জাতি হইলে তাহার প্রতিবাদ চলিতে পারিত।

শূন্য মনটা লইয়া অমিতা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মেয়েকে বারণ করিয়াছিল স্কুলে যাইতে—আবার ঘরের গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিয়া আসিল।

পিসীমা সারদা সুন্দরী এই সব বিবি বউ দের সহিত কোন কালে সন্ধি করিতে পারেন নাই, সে কারণ তিনি আপনার রান্না-বান্না ও ঝি-মহল লইয়া আপনার মহলেই পড়িয়া ছিলেন।

অমিতার সহসা প্রভাবতীকে মনে পড়িল, পাড়ার মধ্যে বন্ধু থাকিতে ঐ প্রভাবতীই ছিল; প্রভাবতীকে ডাকিয়া পাঠাইল, তাহার হৃদয়ের সহিত তাহার অনেক জায়গায় মিল খায়। প্রভাবতীও তাহার মত স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত, তাহার রূপ নাই বলিয়া স্বামী আর একটি রূপসীকে বিবাহ করিয়া প্রভাবতীর বিবাহের ভালমত প্রতিশোধ তুলিয়াছেন। প্রভাবতীর স্বামী এখন স্পষ্টই বলে শুধু গুণ, আর বিদ্যায় বংলার ছেলেদের আশা মিটিবে না, ভোগের দাসী হইয়াই থাকিতে হইবে, এবং পুরুষের কামানলের মুখে ইন্ধন জোগাইয়া আপনাকে প্রস্তুত

করিয়া রাখিতে হইবে। নারী স্বাতন্ত্রের কথা সে অভিধান হইতে একেবারে ছাঁটিয়া কাটিয়া ফেলাইতে হইবে।

প্রভাবতী ঠোঁট দুটি লাল করিয়া লালপেড়ে সাড়ীটি পরিয়া অমিতার ঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামবর্ণের উপর লালপেড়ে সাড়ীটি ভারি সুন্দর মানাইতেছিল, এবং মুখের ভাবেও একটা তেজস্বিতা—একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পরিষ্কার ধরা যাইতেছিল। প্রভাবতী আসিতেই অমিতা চেয়ারটা আগাইয়া দিয়া বলিল, এত রূপেও সখী জয় করতে পারলে না—বল্লে কিনা কুৎসিত! কিছু না, শুদ্ধমাত্র এ একটা খুসীর খেয়াল!···

প্রভাবতী হাসিয়া বলিল, "আজ যে সখীকে একটু উষ্ম রকমই দেখাচ্ছে!'

অমিতা বলিল, "উঁহু উষ্মা নয়···সত্যি কথা—সত্যি সত্যি কথা, একবারে ভাতের কাঙালী করে রেখে—আমাদের মনুষ্য সমাজের বাইরে ফেলে দিয়েছে, এতখানি অবিচার যে চল্লো তোমার পরে, একটু কোথাও প্রতিবাদ উঠ্‌লো? এত সস্তায় তোমাদের রূপ-যৌবন বিকিয়ে যাচ্চে বাংলার মেয়েরা···তোমরা তার কিছু করতে পাচ্চো না! যেন বস্তা পচা রাবিশ মাল, কবি সত্য বলেছে—"কুলটাদের মূল্য আছে কুলবালার মূল্য নাই।"

অনাবশ্যক একটা গর্জ্জন আপনি অমিতার ভিতর হইতে ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিতেছিল, প্রতিরোধ করিবার কোন সাধ্য তাহার ছিল না। একটা ঝগড়া করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি তাহার ভিতরে কেবলি ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, প্রভাকে দেখিয়া তাহার দুর্ব্বার নিয়তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া খুব খানিক বর্ষণ চলিল, এ বাক্য-স্রোতটুকু পথ ধরিয়া না বাহির করিয়া দিতে পারিলে হয়ত তাহার বাঁচিয়া

থাকাই দায় হইত। প্রভাও একান্ত নির্ব্বিবাদে তাহার রেশটাকে বাড়িয়াই যাইতে দিল। কোন প্রকার সমালোচনার দ্বারা প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিল না। তারপর যখন অনেকখানি অমিতা থামিয়া গেল, তখন প্রভা হাসিয়া কথা তুলিয়া বলিল, বলি সখি ব্যাপারখানা কি ?

অমিতা বলিল, ব্যাপার আর কি ?...মেয়ে মানুষের যা সব চাইতে বড় জিনিষ, স্বামীর মন বিগেড়ে গেছে, আর রক্ষে আছে ? দেখ না কতখানি আমি বকে গেলুম ! কিন্তু স্বামীর যদি দুটো পাঁচটা স্ত্রী মরেই যায়...তা'হ'লে কথা শুনবে, লোকে বলবে, পুরুষের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের একটা নখ ছিঁড়ে গেছে মাত্র। কতখানি অপমানের কথা একবার ভাবো দেখি ! প্রভা বলিল—"দেখ বাঁদীগিরী ক'রে ক'রে চার যুগ ধরে আমাদের মনটা এতটুকু ফাঁক পাবার অবসর পায়নি, তাই বাঁদীত্বটা স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, কাকে বলবে ভাই তোমার কথা...আর কেই বা তোমার কথা শুনবে ? সহৃদয়তার এতটাই অভাব !" অমিতা বলিল, "নিশ্চয়ই সহৃদয়তার এতটা অভাব।" প্রভা আবার বলিতে লাগিল, আমার দাদাকে বল্লুম, জানো ত আমার দাদা কতখানি ভাল...বল্লুম দাদা, আমায় পাড়া-গাঁয়ের স্কুলে একটা মাষ্টারীতে পাঠিয়ে দাও। দাদার যদিবা কোন গতিকে একটু মত হ'লো, বাড়ীর কারু ভরসা হলো না।...মা গো মেয়ে মানুষ দূর বিদেশে চাকরী করতে যাবে কি ?...হিন্দুর ঘরের মেয়ে ! আত্মসম্মান, ইজ্জত, কিসে বজায় থাকে বলো ? সাধে কি আমরা এতখানি অসহায় হয়ে পুরুষের কবলে গিয়ে পড়েছি ?...আমাদের ঠেকিয়েছে ঐ এক ভাতের দায়ে। আমার স্বামী আবার কি বলে পাঠিয়েছে শুনেছ...বলেছে আদালত করতে বলো না বিবি-সাহেবকে, মাসোহারা দেবো ! অতি দুঃখেই একটা কঠোর রকম হাসি তাহার চারিদিকে ইস্পাতের ফুলের

মত ছড়াইয়া পড়িল। অমিতা অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া বলিল, আমাদের কোন উপায় নাই! কোন উপায় নেই প্রভা?...

প্রভা বলিল, "আমাদের কোন উপায় নেই ভাই, পুরুষের ইচ্ছার দ্বারেই আমাদের চিরজন্ম আত্মঘাতী হ'য়ে মরতে হবে—সেই দাস যুগের মত।" অমিতা তাড়াতাড়ি বলিল,—"তুমি নিজে চেষ্টা ক'রে চাকরী নাও বলছি প্রভা, কারও কথা শুনোনা, আজ দাদা আছেন, দাদার একটু হৃদয় আছে, দাদার পরে যাঁরা সংসারে বসবেন...উঁহু চাইকি পথের বেরও ত ক'রে দিতে পারে।"

প্রভা বলিল, "কিছুই অসম্ভব নয় অমিতা, বাঙালীর মেয়ের বরাতে একদিন সবই ঘটতে পারে—এতটা পর-প্রত্যাশী জীব ত আর ভূভারতে নেই, নইলে—কোন্ দেশে লম্পট বেশ্যা-সক্ত মদ্যপ স্বামিকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করবার বিধি আছে, তাই বল?"

অমিতা অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"তোমার স্বামীও খুব লম্পট ছিল না?" প্রভা বলিল, "শুধু লম্পট নয় ভাই, মদ্যে আসক্তিও খুব বেশী ছিল, বড়লোকের ছেলে, বাপ অনেক টাকা জমিয়ে থুয়ে গিয়েছিলেন, তার সদ্ব্যবহার ত চাই, প্রতিবাদ করাতেই একবারে তাঁর মনের বাইরে চলে এলুম। তিনিও বিবাহ ক'রে আমাকে জব্দ করবার এক সুন্দর উপায় বের ক'রে ফেল্লেন। আমিও এমন স্বামী সৌভাগ্য গর্ব্বে ধন্য হ'য়ে দাদার বাড়ীতে এসে পেটটা পালছি।"

কথা তাহাদের এম্নি রোজ চলিত, এবং আরো অনেকখানি চলিত যদি মাঝ খান হইতে ডাক পিয়নের চিঠি আসিয়া গোলমাল না বাধাইত। একদিন এম্নি তাহাদের প্রত্যাহিক দ্বিপ্রহরের কথাবার্ত্তা

চলিতেছে, এমন সময় নেত্য ঝি চিঠি দিয়া বলিয়া গেল,—"বাবু, সরকার মশাইকে চিঠি লিখিছেন সবাই প্রস্তুত থাকো, পত্র পাইলেই কন্যা রেখাকে লইয়া সোণাখালিতে যাইতে হইবে, সেখানে একটী সুপাত্রের সন্ধান মিলিযাছে।"

অমিতা চিঠি পড়িয়া অবাক হইয়া গেল। এ চিঠি অবশ্য স্বামী তাহার তাহাকেই লিখিয়াছেন। অমিতা সভীতি বিস্ময় কণ্ঠে চিঠি খানা প্রভার হাতে দিয়া বলিল, "এর মধ্যে ঐ এতটুকু মেয়ের বিয়ে দেব কি প্রভা?"—অমিতার যেন ইচ্ছা করিতে লাগিল ডাক ছাড়িয়া খানিক চীৎকার করিয়া কাঁদাকাটি করিয়া লয়। তব চাইতে মেয়েকে এবং মেয়ের মাকে টুঁটি টিপিয়া হত্যাকরা যে ভাল ছিল।—

প্রভা কয়দিন হইতে ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল বলিল, "কিছু না—অসহিষ্ণু পুরুষ মুখে কথাটিমাত্র না ক'হে এই প্রমাণ করতে চান, স্ত্রীলোক চিরকালই পুরুষের ইচ্ছার ক্রীতদাসী। —হয়ত কবে কোন দিন পান হ'তে চুণটি বুঝি খসেছিল, তারই জের চলছে।—

পিসীমা সারদাসুন্দরী এই সময়টাতে হঠাৎ এইধারে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কথা-বার্ত্তার কতক অংশ তাঁহার কাণেও গিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "তোমরা বাছারা মনে যাই ভাবো, আমার ভাইপোর তোমাদের পরে এতটুকু অবহেলা নেই, তবে একটা খেয়াল এই উঠেছে তার মনে, বামুনের ছেলে বামুনের ছেলের মত থাকবো, তাতে কারো তোয়াক্কা রাখা চলবে না,—আমাকে যেমন বলেছিল মা আমি তেমনি বল্লুম।" বলিয়া পিসিমা চলিয়া গেলেন, অমিতা ও প্রভা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল।—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রেখার বিবাহের কথা অমিতার বাপের বাড়ীতে যে শুনিল, সেই অবিশ্বাস করিয়া বসিল। এক ত সেদিনকার মেয়ে—অমিতা, তায় মেয়ে রেখা, তার বিবাহ, এ হ'তেই পারে না। অমিতা কিন্তু বার বার পত্র দিয়া নয়—নিজে শুদ্ধ আসিয়া জানাইয়া গেল, স্বামী তাহার ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম অনুসারে কন্যাকে বারো বৎসরের পূর্ব্বেই দান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, একথার আর নড় চড় হইবে না। প্রমাণও দেখাইল, সঙ্গে যেরকম সাধু সন্ন্যাসীরা লাগিয়া আছে, এবং যেরকম ভাবে আপনাকে পরিবর্ত্তনের মধ্যে ফেলিয়াছে।

অমিতার মাও ভাবিয়া দেখিল, ততবড় সাহেবী মেজাজের লোক একদিনে যদি সব সাহেবী কায়দা-ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে, তবে তার দ্বারা অসম্ভবই বা কি?—কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কি করবি মা অমি—বরাতে যা আছে তাই হবে।—

অমিতা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "বরাতে যা আছে তাই বলে অমি চুপ চাপ চোখ বুজে, সহ্য ক'রে যেতে হবে, কক্‌খনো না…বরাতের সঙ্গেই না হয় একবার মুখোমুখী ল'ড়ে দেখা যাবে।" অমিতার মা আরও ভয় পাইলেন, ভাবিলেন, কন্যা জামাইর সহিত যদি একটা ঝগড়া-ঝাটিই করিয়া বসে—সিদ্ধেশ্বরকে বলিলেন, "তুমিই না হয় সিধু একবার সোণাখালি দিয়ে ঘুরে এসো। কালকের দিনটা ত রবিবার, সিদ্ধেশ্বর অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "অগত্যা তাই, যেমন পাত্রে অমিতাকে দান করা গিয়েছিল।" মনের ভিতর তাঁহার কেবলি সোণাখালির ম্যালেরিয়ার কথাটা উঠা-পাড়া করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "একদিন বৈত নয়…এক কুঁজো কলকাতার জল না হয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো।"

এ আলোচনার মধ্যে নরোত্তম কখন আসিয়া যোগ দিয়া বসিয়াছিল, তাহা কারও নজরে পড়ে নাই। হঠাৎ সে একমুখ হাসিয়া সিদ্ধেশ্বরকে বলিয়া উঠিল, "তুমিও পাগলের সঙ্গে পাগলামিতে মাতলে নাকি সিদ্ধেশ্বর বাবু? দেখছোনা সিমটম—সব উন্মত্ততার...

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সিদ্ধেশ্বর নরোত্তমের মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবিলেন, নরোত্তম যা বলিতেছে, তাতো অসম্ভব নাও হইতে পারে। বলিলেন, "তবে সোণাখালি যাবো না নরোত্তম?"

নরোত্তম বলিল, "তার কোন প্রয়োজন নেই, তোমার ভগ্নী অমিতাকেও তাই বলে এলাম, সেও অনেক কাঁদাকাটি ক'রছিল, আমি গিয়ে আশ্বাস দেওয়াতে তবে ঠাণ্ডা হ'লো। সন্ন্যাসীদের ভেল্কী বুঝতে পাচ্ছ না, হয়ত কোন গাছের শিকর জরী তাঁকে খাইয়ে দিয়েছে, দিয়ে বুদ্ধিভ্রংশ ক'রে ফেলেছে...এখন সন্ন্যাসী যা বলবে তাই তাঁকে পোষমানা কুকুরের মত ক'রে যেতে হবে। নজীরও দু একটা দেখাইল একবার "সিনিতে" থাকিতে কি রকম এক তান্ত্রিক কাপালিক তাহাদেরই পাড়ার এক উকীলের ছেলেকে জঙ্গলের ভিতর সাত দিন অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল তাহারই রোমাঞ্চ-কর কাহিনী বলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বর ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "অমিতাকেও এই রকম ক'রে বুঝিয়ে এসেছ ত?" নরোত্তম বলিল, "তা আসবো না? আমার বোঝানতে তবে ত একটু শান্ত হলো!"

সিদ্ধেশ্বর যেন দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন এই আশ্বাসে একটু স্ফূর্ত্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা শিক্ষিত মনেরও এ রকম অধঃপতন ঘট্‌তে পারে তাতো আমি জান্তুম না।"

নরোত্তম বলিল, "শুধু ইউনিভারসিটির ডিগ্রী নিলেই যদি শিক্ষিত হওয়া যেতো—তবে ভাবনা ছিল না, তাঁর চাইতে তোমার ভগ্নী যে

শিক্ষিত, তা হাজার বার বলবো, স্বামীর চাইতে স্ত্রী অনেকখানি মুক্ত-মনের সন্ধান পেয়েছেন।”

কথাটা সিদ্ধেশ্বর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, স্কুলে কলেজে পড়িবার সময় অমিতা কত যে প্রাইজ পাইয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অমিতাদের বাড়ীর সরকার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সরকার একখানা টেলিগ্রাম দেখাইয়া বলিল, “দেখুন, বাবু দেশ হ’তে টেলিগ্রাম ক’রেছে, আগামী কালকের মধ্যেই সবাইকে সোণাখালি যেতে হবে।”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, “এই মাও ঠ্যালা। বলি হাঁ হে সরকার তোমাদের বাবু আজকাল গাঁজা টাঁজা খুব বেশীমাত্রাতেই চালাচ্ছে; ব্যাপারখানা কি বল দেখি?” সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিয়া বলিল, “আজ্ঞে আমরা সামান্য মানুষ, এতশত খবর কি জানি—বলুন।”

নরোত্তম বড় সিগারে আগুন ধরাইয়া সেটাতে বেশ জোর একটা টান দিয়া বলিল, “তবু?” ভাবে বোঝা যায় তিনিও এই ব্যাপারটার জন্য যথেষ্ট মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতেছেন। সরকার বলিল, “আজ্ঞে যদি সত্য কথা বলতে হয়, তবে একদিন আমি দেখেছি, আমাদের চাকরটা গোলাপ জল দিয়ে বাবুর জন্য গাঁজা টিপ্‌ছিলো। বাবুর মুখেই শুনেছি, গাঁজাতে ভারি মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়।”

“হুঁ” বলিয়া আড়নয়নে নরোত্তম সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার মানে এই—নরোত্তমের অনুমান তুমি ধরিয়া লও। সরকার নফরচন্দ্র অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, “তাহ’লে মাঠাকরুণকে কি খবর দেবো বলুন।”

সিদ্ধেশ্বরকে আর জবাব দিতে হইল না, নরোত্তমই বলিয়া দিল, খবর দাওগে—তোমাদের মা-ঠাকুরাণীও একখানা টেলিগ্রাম করুন।

যদি জামাই তাঁর নিতান্ত পছন্দ হ'য়ে গিয়ে থাকে—তবে জামাই কল্‌কাতায় নিয়ে আসুন, পাঁচজনে দেখুক, তারপর মত হয়, মেয়েকে সেই জামায়ের হাতেই সম্প্রদান করা যাবে। এ ত আর অরক্ষণীয়া কন্যা নয়, যে আজই না গেলে পরশুদিন জাতিতে একঘ'রে থাকতে হবে? নফর প্রণাম দিয়া বিদায় হইল।

এখানে অমিতা ছট্‌ফট করিয়া বেড়াইতেছিল, একবার হাল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিবার সংকল্প করিতেছিল, আবার একবার স্বামীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া দাঁড়াইবে বলিয়া আপনার ভিতরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করিয়া লইতে ছিল, তবে একটা কথা বেশ মনে ঠিক দিয়া জানিতে ছিল, যদি লড়াইয়েতেই নামিতে হয়—একলা সে মেয়ে-মানুষ ততটা সুবিধা কিছু ঘটিয়া উঠিবে না, একটা দক্ষিণ হস্ত চাই। দক্ষিণ হস্তকে হাতের কাছে পাইয়াও গিয়াছে, কিন্তু তাহার যা কল্পনা তা যে অতি বিশ্রী···সে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছে "স্বামী পাগল" এই কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া দাও। পাগল না বানাইয়া ছাড়িলে তাহারও মুক্তির কোন দিশা নাই।

সরকার গিয়া নরোত্তম যা বলিয়াছে, এবং সিদ্ধেশ্বর যা বলিয়াছে তাই যথাযথ বলিয়া গেল। অমিতা একখানা টেলিগ্রামের ফারম টানিয়া নিজেই তাহাতে যাওয়া হইবে না লিখিয়া, সরকারকে তখুনি টেলিগ্রাম করিতে বলিয়া দিল। হুকুমের চাকর হুকুম তামিল করিতে গেল। কিন্তু নীচের তলায় ভারি একটা গুঞ্জন জাগিয়া উঠিতে লাগিল। পীসিমা সারদা সুন্দরী স্পষ্টই নেত্যঝিকে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"ওরে বাসরে কালে কালে এ কি হত-কাল হয়েই দাঁড়াল, স্বামী মেয়ের বিয়ে দেবেন স্ত্রীর তাতে মত নেই, দেশ ঘর, নিজের বাড়ী, সেখানে যাওয়া চলবে না। এই কলকাতার মধ্যে খাঁচার পাখীর মত চিরটা জীবন মরে পচে থাকতে হবে।

অমিতাও আর থাকিতে না পারিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "যার না পোষায় তিনি এখ্নি বেরিয়ে যেতে পারেন।" পিসিমা প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন নেত্যকে বলিলেন, "আয় নেত্য—আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবি, এ খৃষ্টানের বাড়ীতে একদণ্ড থাকৃতে চাইনে।"

নেত্য সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দাঁড়াও মা বাবু আসুন, তারপর তুমি যেয়ো। আমিও হুকুমের চাকর, হুকুম না পেলে কার হুকুমে যাই বলো?" নেত্য একবারে হাঁকাইয়া দিল, পিসীমা তখন কাঁদিতে বসিলেন, "ওরে বাবা বৃন্দাবন চন্দ্র কোথায় আছিসরে, আমাকে এ মথুরার কারাগার হতে উদ্ধার করে নিয়ে যা বাবা। ইত্যাদি।"

যাহাকে লইয়া এতখানি ব্যাপার সেই কন্যা রেখার কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই, বিবাহ তাহার হইলেই বা কি, না হইলেই বা কি, বিবাহ সম্বন্ধে এমন কিছু জ্ঞানের পরিচয় তাহার ছিল না—তাই লইয়া একটা মতামত দিতে পারে। তবে পাড়াগাঁয়ে জীবনে কখনো যায় নাই, পাড়াগাঁয়ের নামে তাই তাহার ভিতরটা একটু যা উতলা হইয়া উঠিতেছিল, সেখানকার আকাশ বাতাস—মাঠ কেমন, ও কি সুন্দর! এই কথাগুলা লইয়াই সে নাড়াচাড়া করিতেছিল।

অমিতা একবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবি রেখা?" রেখা বলিল—"তুমি যদি সঙ্গে যাও তবে নিশ্চয় পারবো।" অমিতা একটা ধমক দিয়া বলিল—"কখনো না। তোর বাবা যদি এসে তোকে জিজ্ঞাসা করে, সেখানে থাকতে পারবে মা? তুই ওম্নি বলবি, কক্‌খনো না! কেমন মনে থাকবে ত?" "হাঁ মা মনে থাকবে" বলিয়া ভয়ে ভয়ে রেখা মায়ের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার মায়ের মুখের এমন দীপ্তি কোন কালে সে দেখে নাই। যেন সে মায়ের মুখ এ নয়, যেন সারা-দিনমান আগুনের উপর দিয়া চলিয়া এম্নি

কালীবর্ণ মুখটী করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে।

রেখার যেন কান্না পাইতে লাগিল, মায়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া মিনতির স্বরে বলিল, "মা এতটা মলিন ত তুমি ছিলে না। এ কি হয়ে যাচ্ছো মা?" অমিতা দূর শূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল, খালধারের পাট কলটা হইতে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করিয়া আকাশের চাঁদটাকে কালিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে সে তাই দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কে জানে "সত্যিই আমি কলের ধোঁয়ায় কালী হ'য়ে যাচ্ছি কি না?—"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোটর হইতে না নামিয়াই নরোত্তম ঝিকে দিয়া অমিতাকে নীচে ডাকিয়া পাঠাইল। অমিতাও তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাড়াতাড়ি চটিটি মাত্র পায়ে দিয়া, বাহির দরজায় যেখানে নরোত্তম গাড়ীতে বসিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। নরোত্তম কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, "চট্ করে গাড়ীতে উঠে পড়ো, আবার এক্ষুণি ফিরে আসবে, ভারি একটা চমৎকার প্ল্যান মাথায় এসেছে, একরকম তোমার দাদাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর আবার বাতের বেদনাটা বেড়েছে, জানোই ত বাতের বেদনায় তাঁর কি রকম যন্ত্রণা, ডাক্তারও সেখানে আছেন।"

অমিতা বলিল, "গায়ের চাদর টাদর কিছু আনিনি যে, নরোত্তম বলিল, "ঝিকেই বাইরে যা আছে, এনে দিতে বলো না।"

অমিতা নেত্যঝিকে কাশ্মিরী একফর্দ্দি শালখানাই আনিতে বলিল। ঝি চলিয়া গেল। অমিতা চারিদিকে চাহিয়া, যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে নিম্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি উপায় ঠাউরেছেন নরোত্তম বাবু? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই নরোত্তমের দিকে চাহিয়া রহিল।

নরোত্তম অমিতাকে সাহেবিকেতায় হাত ধরিয়া গাড়ীর মধ্যে বসাইয়া বলিল, তোমাকে দিয়েই যখন নাট্যারম্ভ, তখন তোমাকে বাদ রাখা মোটেই যাবে না, পরে শুনবে,” ঝি শাল লইয়া আসিল।

অমিতা একটু উচ্চ কণ্ঠেই বলিল, ঝি-ও শুদ্ধ সঙ্গে চলুক না!

নরোত্তম বাধা দিয়া বলিল, secret matter কি দরকার? এই এক্ষুনি ত আবার ফিরে আসা চলবে।

ঝি বলিল, দোহাই বাবু শীগ্‌গীর মাঠাকরুণকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন।

ভোঁ ভোঁ করিয়া শোফার মোটারে ষ্টার্ট দিল।—নিমিষে গাড়ী বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া গেল। নরোত্তম ড্রাইভারকে চীৎপুর রোডের রাস্তা না ধরিয়া কলেজষ্ট্রীট দিয়াই বরাবর যাইতে বলিল।

অমিতা আর একবার জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় যাওয়া হবে?”

নরোত্তম আর একটু কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, ভয় কচ্চে?

অমিতা শুষ্ক স্বরে বলিল—“না ভয় কিসের?”—নিজের ভিতর অনেকখানি সাহসও সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিল।

নরোত্তম একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, “বাস্তবিক তোমার জন্য আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে, বিশেষ তোমার মা বেচারীর দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায় আমায় কতবার বল্লেন, বাবা তোমরা সবাই রয়েছো, অমির

একটা বিহিত করবে না? তারপর আর যা বল্লেন যাক সে কথা তুমি না-ই শুনলে!

অমিতা আগ্রহ ভরে বলিল, মা আর কি বলেছেন, শুনি না?

নরোত্তম কথাটাকে অন্যধারে ফিরাইবার ছলে বলিল, সে আমি তাঁকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি, তবে কি জানো মায়ের মন, তোমার মা কতবার করেই বল্লেন, বিলেত হ'তে ফিরে এলে যদি নরোত্তমের সঙ্গেই অমির বিবাহ দেওয়া যেতো, কত ভাল হতো।—আমি ত হেসেই আকুল···বলি এতলোকের সামনে মা বলেন কি?···

নরোত্তম এই ফাঁকে একবার অমিতার মুখের দিকে চাহিয়া লইতেও ভুল করিল না, কিন্তু অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। তবে এইটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারা গেল, অমিতা এই কথায় অনেকখানি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নরোত্তম বলিয়াই যাইতে লাগিল—"ডাক্তার সম্ভব, তোমাকে তোমার স্বামীর মনের গতিকের কথাই জিজ্ঞাসা করবে, তুমি যা সত্যি তাই বলবে, কারণ সত্যের পথ নিরঙ্কুশ!" আবার একটু থামিয়া বলিল, "তেমন ভয়ের কারণ—তোমার কিছুই নেই, আমাদের বা তোমার দাদার ভাবনা এই কারণে—বাস্তবিক যদি তিনি বরাবর এই রকম whimsএ চলেন, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ ভাল্ হবে না এ নিশ্চয়, কারণ সাইকলজিতে বলে—যখন কোন মানুষ whims বা বড় আইডিয়ার ঝোঁকে মাতে—তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে, হাতের কাছের ব্যারিষ্টার দাশ সাহেবকে দিয়েই দ্যাখ না—অতবড় একটা লোক দেশের খেয়ালে সপুত্র কলত্র সন্ন্যাস নিলে।

অমিতা তাহা জানিত, তাই আইডিয়া এবং আইডিয়া লইয়া যাহারা খেলা করে তাহাদের ভাল চক্ষে দেখিতে পারিত না। ভাবিত, ভবিষ্যতের কি একটা অনিশ্চিত রকম ভয়ানকতা ইহার মধ্যে ঘনীভূত হইয়া আছে,

অমিতার স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার এই একটা প্রধান কারণ যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের খেয়ালে তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার দয়া করে আমাদের সাইড নেবেন কি ?"

নরোত্তম বলিল, তোমার দাদা, আমি—যে সাইডে আছি, তোমার বিশ্বাস হয় ডাক্তার একটুও বিরুদ্ধ রিপোর্ট দিতে পারবে ? তাছাড়া ডাক্তার আমারও একজন বন্ধু, বিলাতে অনেক সময় একই রেঁস্তোরায় কাটিয়েছি।

অমিতা আর কিছু বলিল না, সরিয়া সরিয়া আপনার শুচিতা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ভাব দেখিয়া নরোত্তমও একটু দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু মনে মনে হাসিতে লাগিল, সে নিশ্চয় জানিতেছিল অমিতা কোন দিন তাহার শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না। একটি কথাতেই যখন ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে।

"এই হিঁয়া ঠারো।" ড্রাইভার গাড়ী থামাইল, সম্মুখে এক বৃহৎ নবনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখা যাইতে লাগিল, চুনের কাজ সারা হইয়া গিয়াছে, কাঠের কাজও প্রায় সারা, এখন আসিয়া বাস করিতে পারিলেই হয়।

অমিতা বহু আকাঙ্ক্ষার তাহাদের বাড়ীখানি দেখিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও মনে জাগিয়া গেল, স্বামীর যদি খেয়াল হয় এ বাড়ীও ব্রহ্মণ্য-দেবের নামে দান-পত্র করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন। অমিতার চোখে মুখে আগুনের মত একটা জ্বালা ঠিকরাইয়া পড়িল।

নীচের তলায় একজন বেহারা মিট্ মিটে আলো জ্বালাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে আলো লইয়া সঙ্গেই উপরে যাইতে চাহিল, নরোত্তম তাহাকে তাহার আসিবার কোন প্রয়োজন নাই জানাইয়া দিল।

দোতলার মাঝখানকার হলটায় দাঁড়াইয়া নরোত্তম ডাকিল—অমিতা···

অমিতা ভাবিল, হয়ত পথ পাই নাই বলিয়া তিনি সাড়া লইতেছেন বলিল,—আমি পথ পাচ্চি, তুমি চলো।

নরোত্তম হাসিয়া বলিল, তুমিই যে এই বাড়ীর রাণী Queen of the Dark chamber কেন পথ পাবে না?···হা—হা—" নতুন চুন ধরানো ঘরে হাসিটা প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। অমিতার বুকের ভিতরটা একবার দুলিয়া উঠিল, কোন প্রত্যুত্তর করিল না। ক্রমে ত্রিতলের একটা বৃহৎ হলের সম্মুখে দুজনেই দাঁড়াইয়া গেল। অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কোথায়?" তাহার যেন কেমন ভয় লাগিতেছিল।

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করিল···ভয় লাগছে কি?

অমিতা এবারও বলিল···না, ভয় কি?

"আচ্ছা অপেক্ষা করো" একটা সুইস টিপিয়া দিয়া পাশের একটা কামরায় প্রবেশ করিল। সেখানে ঘরের মধ্যে টেবিলের উপরে একটা বোতলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গেল। ডাক্তার হয়ত রাত্রি বেলাকার Drinking, এখানে বসিয়াই সারিয়া লইতেছিল, ফিস্ ফিস্ তাহাদের কি কথাবার্ত্তা হইল, অমিতা তাহা শুনিতে পাইল না। খানিক পরে নরোত্তম বাহিরে আসিয়া বলিল, "ডাক্তার আসছেন অমিতা, তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না।"—সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও প্রবেশ করিলেন।

ডাক্তারকে একটা নমস্কার করিয়া অমিতা পাশের বড় চেয়ারটার উপর বসিয়া গেল। ডাক্তারও প্রতি নমস্কার সারিয়া একটা হাতা দেওয়া চেয়ারে বসিলেন, ডাক্তার একটা গোল্ডটিপ সিগারেটে আগুন ধরাইয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিলেন, চশমাটা যদিও চোখে আঁটা ছিল, পুনর্ব্বার সেটা খুলিয়া আবার শ্যাময় লেদার দিয়া

সাফা করিয়া চোখে লাগাইলেন, এই চশমাটা দিয়া একবার অমিতার মুখের দিকেও চাহিয়া লইলেন। আধ ঘোমটা টানা এই মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিলেই কেমন একটা হাহাকার জাগিয়া উঠে, বিদ্যুতের আলোকে হাতের সোনার চুড়িগুলি চিক্ চিক্ করিতেছিল, গায়ের শালের চাদর খানিতেও তাহাকে শ্রেষ্ঠ নাগরিকার উচ্চ আসন দেওয়া যায়—তবু তাহার পানে চাহিলে দুঃখও হয়।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গরমেণ্টে দরখাস্ত করেছিলেন যে আপনার স্বামী উন্মাদগ্রস্থ হ'য়ে সংসারে, সমাজে, একটা বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টায় আছেন।"

অমিতা নিরুত্তরে মুখটা নত করিয়া রহিল।

নরোত্তম তাড়াতাড়ি বলিল, হাঁ—ডাক্তার সাহেব তাই, একটা ভীষণ রকম স্বেচ্ছাচারিতা···।

ডাক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চান আপনার স্বামীকে সংযত করা হোক?"

অমিতা বলিল—হাঁ।

নরোত্তম বলিল, উচ্ছৃঙ্খলতা কে পছন্দ করে, আপনিই বলুন না ডাক্তার বাবু? ভাল হোক, মন্দ হোক, যাই হোক একটা সভ্যতা আপনা আপনি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। বৃন্দাবনবাবু চান সেটা ধূলিস্যাৎ করে আবার dark যুগেই ফিরে যেতে!—কিছু না, কতক গুলো গাঁজাখোর সন্ন্যাসী তাঁকে পেয়ে বসেছে, তারাও কসে দম লাগাচ্চে, তাদের বাবুকেও সঙ্গে সঙ্গে দম দিতে ছাড়চে না, একটু গলা ঝাড়িয়া আবার বলিতে লাগিল—এ অবস্থায় অমিতার গরমেণ্টের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি? অনেক বড় লোকের ছেলেও ওম্নি কুসঙ্গে পড়ে যখন উচ্ছন্নে যাবার রাস্তায় দাঁড়ায়, তখন গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অব

ওয়ার্ডের হাতে সম্পত্তি তুলে দিয়ে এষ্টেট বাঁচায়। আমার মামার বাড়ীর এষ্টেট ঐ একই কারণে আমারই ত্থাখ্‌তা দু-দুবার রিসিভারের হাত ঘুরে এলো!

ডাক্তার বলিলেন, বৃন্দাবন বাবুকেও একবার আমার দেখা চাই যে।

নরোত্তম বলিল, এখন দেশের বাড়ী গিয়েছেন, দু একদিনের মধ্যেই আসছেন, দেখবেন তখন হাইকোর্টের একটা বড় উকীল, বাড়ীতে নামাবলী গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খালি পা, টিকি একহাত লম্বা হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা-আহ্নিক, কাঁসর ঘণ্টা সব বরদাস্ত করতে পারা যায় কিন্তু টিকি কিছুতে বরদাস্ত করতে পারা যায় না। হুঁ—তারপর আর এক নূতন কীর্ত্তি শুনুন, এই এনার একটি মেয়ে আছে, নিতান্তই কচি, ৭।৮ জোর দশ বৎসর যদি বয়স হয়, বৃন্দাবন বাবু দেশ থেকে চিঠি লিখে—পাঠিয়েছেন, মেয়েকে নিয়ে সব এইখানে এসে পড়ো, এখানে একটা সুপাত্র স্থির করা গেছে, এক ত দেশের নামে বুঝতেই পাচ্চেন ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি···তার উপর সাপ ব্যাং গুলোকে না হয় বাদই দিলুম। আপনি চমকে উঠবেন না ডাক্তার বাবু, আমার কথা একবারে খাঁটি সত্যি, যে পাত্রটীর সংবাদ তিনি পাঠিয়েছিলেন, খবর পাওয়া গেল, এক জোড়া পীলে লিভর নিয়ে তিনি দিনে দুবার ক'রে যমরাজার দুয়োর হতে তাড়া খেয়ে ফিরে আসেন, আর অবস্থার কথা কহতব্যই নয়! ইউনিভার্সিটীর কোন মুখো—দুয়ার, তা তিনি শোনেন নি, তবে গুণের মধ্যে আছে মহাকুলীনের বংশ, সর্ব্বানন্দ মেল, আর যায় কোথা,—বৃন্দাবন বাবুর বিজ্ঞানও মত দিলে, বিশুদ্ধ রক্ত, তাজা বামুনের ছেলে, পাছে এমন পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যায় এই জন্য আর সবুর পর্য্যন্ত তাঁর সইছে না···ব্যাপারগুলো ভেবে দেখুন।···

ডাক্তার সাহেব "শেম শেম" বলিয়া মুচকি হাসিয়া আর একবার

ভাগ্য নিরুপীতার মুখের দিকে ঈষৎ চাহিয়া লইলেন। নারী স্থির লক্ষ্যে এক চিন্তাতেই একদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার চক্ষের পলকও যেন পড়িতেছিল না।

"আচ্ছা বড় ডাক্তারকে রিপোর্ট দেব," বলিয়া ডাক্তার সাহেব টুপিটা মাথায় দিয়া ছড়িগাছটি হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। অমিতার দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করিয়া,'Good Night Madam বলিয়া বিদায়টা লইতে ভুল করিল না। নরোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আলো দেখাইতে হইবে কি? ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—না।

মিনিটখানেক চুপ চাপ থাকিয়া নরোত্তম বলিল, "তাহ'লে আমাদেরও আর মিছে মিছি রাত করে সময় নষ্ট করা কেন?" অমিতা বলিল, তার প্রয়োজনই বা কি?

নরোত্তম যখন তাহার টুপিটা লইতে যাইতেছিল, অমিতা বারণ করিয়া বলিল, "থামো একটু বসাই যাক, আচ্ছা, তুমি ভাবী জামাইএর এত খবর কি ক'রে জোগাড় করেছিলে?" নরোত্তম হাসিয়া বলিল, "অমিতা—যতই তোমরা গানে গল্পে নাম কেনো—কিন্তু বুদ্ধিতে এখনও পুরুষের ঢের নীচে আছো।"

অমিতা বলিল, তা স্বীকার করি। কিন্তু তুমি যে রকম ধারা বর্ণনা দিলে, তা যদি বাস্তবিকই হয়, তাহ'লে মেয়েকে নিয়ে আমার দেশ ছেড়ে যেতে হয় সেও আচ্ছা, তবু—

নরোত্তম আশ্বাস দিয়া বলিল, তুমি মোটে ভয় করো না অমিতা, তোমার মায়ের কাছে আমি প্রতিশ্রুত হয়েছি, যে, যেমন করে পারি অমিতাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করবোই।

অনেকক্ষণ আগে হইতেই অমিতার হৃদয় নরোত্তমের পরে গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, এখন আরও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত

ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিয়া এই কথাটা তাহার পুনঃ-পুনঃ মনে হইতে লাগিল—ভাই, দাদা, ভগ্নীপতি, আত্মীয় তাহার এই কলিকাতায় অনেক ছিল বটে, কিন্তু যতখানি উপকৃত হইয়াছে নরোত্তমের কাছ হইতে—এতখানি কাহারও কাছ হইতে নয়।

নরোত্তমের টুপিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। নরোত্তম বলিতে লাগিল, "ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়েই দরখাস্ত থানায় পর্য্যন্ত তোমার সই জাল ক'রে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, তখন আর অবসর পাইনি, তবে আমি জানতাম, তোমার তাতে নিশ্চয়ই সায় থাকবে। সত্যি বলছি, তোমাব একটুখানি কাজ করতে পেলে কেন আমি এত খুসী হয়ে উঠি, বুঝে উঠ্‌তে পারিনে—তুমি হয়ত একদিন কেউ আমার ছিলে, হা হা......

মুখে চোখে শিশুর মত সরল হাসি উপচাইয়া পড়িল।

অমিতা বলিল, "নরোত্তম বাবু মনে পড়ে ?"—

নরোত্তম বলিল, "কি ?"

অমিতা। "একদিন—অনেকদিন আগে—"

নরোত্তম মাথা নাড়িয়া উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কথা বলতে পাবে না অমিতা, সে আমার একটা স্বপ্ন...আমার সমস্ত জীবনকে সেই স্বপ্নের চার পাশে, একটা পদ্মের দলের মত গেঁথে রেখে দিয়েছি, আর সেই কোবকটীর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে আমার কল্পলোকের মানসী"... হাতের রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকাইয়া বলিল, "অমিতা ১০ টা প্রায় বাজলো, উঠে পড়ো !"—

টুপিটা মাথায় দিয়া ছড়িটা হাতে লইয়া নরোত্তম নামিতে লাগিল, অমিতা এবার তাহার হাত ধরিল। উঠিবার সময় উঠিয়াছিল একটা উত্তেজনায়, নামিবার সময় একজনের হাতধরার প্রয়োজন হইল। চলিতে

লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত···বাহ্যজ্ঞান আছে বা নাই ঠিক দেখিয়া বোঝা যায় না।

নরোত্তম সিঁড়ি পথে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদার ওখান দিয়েও ঘুরে যাবে?"

অমিতা বলিল, "তার প্রয়োজন কি?"

নীচে মোটরের কাছে নামিয়া আসিয়া দেখিল, সোফার নাই, চাকরের কাছে খবর লইল, সে রাত্রের আহার সারিয়া লইতে গিয়াছে, নরোত্তম চাকরকে সোফারের সন্ধানে পাঠাইয়া দিল। অমিতা তখনো নরোত্তমের হাত ছাড়িয়া দিল না। দুইজনে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যেন এক জোড়া একপ্রাণ দম্পতির মত—বরং মাঝে মাঝে কাহারও পায়ের সাড়া পাইলে নরোত্তমের লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু অমিতার একটু ভ্রূক্ষেপও নাই। সে বুক ফুলাইয়াই তাহার বন্ধুর হাত ধরিয়া বেড়াইবে, লজ্জা যাহার হয় তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে—অমিতার তাহাতে দৃকপাত করিবার মোটে অবসর নাই। শুক্লপক্ষের বসন্তসপ্তমী তিথি, মৃদু জোৎস্নালোকের সঙ্গে একটা পাতলা ধোঁয়াটে আবরণ জল, স্থল, আকাশে, বৃক্ষ শীর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এই মৃদুতর জোৎস্নালোকে যতদূর দেখা যায় মহানগরী প্রায় ঘুমাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এখান হইতে বাজারের দোকানীদের ঝাঁপ ফেলার শব্দ শোনা যায়! শুধু রাস্তার ধারের আলোগুলিই শেষ অবধি জ্বলিবে। সহসা চারিদিকে আলোকীর্ণ করিয়া আকাশের উপর হইতে একটা উল্কাপাত হইল।

অমিতা সভয়ে নরোত্তমের হাতটা আরো চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওকি? ওঃ—

নরোত্তম বলিল, "আকাশ থেকে একটা তারা ছিঁড়ে খসে পড়ে গেল।"

অমিতা বলিল, কিন্তু আমার বুকের ভিতর কাঁপছে, যেন মনে হচ্চে আমিও কোথাও ছিঁড়ে পড়ে যাবো···নরোত্তম বাবু, আমার পিপাসা পেয়ে গেল যে—ওঃ—ওটা ভ্রষ্ট তারা—!!

নরোত্তম তাহাকে আরো কাছে টানিয়া, চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ভয় কি অমিতা—আমি আছি, সমস্ত পৃথিবী তোমার বিপক্ষে গেলেও আমায় কেউ টলাতে পারবে না!

অমিতা তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া নরোত্তমকে চাপিয়া ধরিল। নিতান্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "তুমি সোফার ডাকাও! আমার বড় ভয় কচ্চে, মনে হচ্চে আমিও যেন খসে পড়্‌চি···যেন আমারও ভার বেশী হয়ে গেছে, ওঃ—

নরোত্তম তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, উতলা হয়ো না অমিতা—কাণ পেতে গ্রহ নক্ষত্রের কথা শোনো; তারা তোমায় ওঠ্‌বার কথাই বলছে—জাগবার কথাই বলছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খবর পাওয়া গেল, বাড়ী আসিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র আরও উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, মুখোমুখী কাহাকে তিরস্কার করেন নাই বটে, কিন্তু কথার ঝাঁঝ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সব চাইতে কোপ-দৃষ্টি অমিতার

দিকেই যেন বেশী।—যা কিছু ভালবাসা, সোহাগ, মেয়েকে লইয়াই হয়। হঠাৎ এক একবার মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উন্মাদের মত আবল তাবল বকে—বলে, মা আর কিছু না হোক—তোকে জড়ের পাষাণ ভার হ'তে মুক্তি দেব...তোকে কল্যাণীরূপে—জগজ্জননীরূপে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনবো··!

এক একদিন সোনার বালা চুড়ি খুলিয়া দিয়া, মেয়েকে বাজারের টাটকা ফুল দিয়া সাজাইয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে মা—মা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—মার বিশ্বপালনত্বিকা মূর্ত্তি ত শুধু এইখানে—

একটা ভাবোন্মত্ত অবস্থা—

তার্কিকদের সহিত তর্ক করিতেও পশ্চাদপদ নয়, বলে, হাল সভ্যতার এটিকেটের নাগপাশ চাইতে, অতীত যুগের সহজ, সরল, কুটীরের সভ্যতা ঢের উত্তম! আমাদের ঐ কুটীরের দিকেই ফিরে যেতে হবে। পশ্চিমের সভ্যতা এদেশের মাটিতে খাপ খাবে না!

অনেকে বৃন্দাবনের রোগের নিদান নির্ণয়টাও সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ বেশ একটুখানি মুচকী হাসিয়াই বলিল, কিছু না, নিজের স্বাধীনা শিক্ষিতা স্ত্রী—যার তার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেটা তাঁর বেশ সহ্য হয় না!—তাই একবারে রোগের মূলে গিয়া পৌছাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ সভ্যতার আর যাই থাক, ঘরের মধ্যে পর-পুরুষের আমদানী নিশ্চয় কম পড়িবে। আসলে এ নূতন মতকে আমদানী করা নয়, ভিতরে ভিতরে একটা যুদ্ধ ঘোষণা—এ যুদ্ধে স্ত্রীর প্রভাবটা কমিতে বাধ্য।

সিদ্ধেশ্বর একদিন দেখা করিতে আসিয়া তর্ক তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তুমি যে একবারে খাঁটি ব্রাহ্মণটী হ'তে চাইছো, তাতে ব্রাহ্মণের মত ত্যাগ করতে পারবে?"

বৃন্দাবন বলিল—সব ত্যাগ করতে পারি আর নাই পারি—ঘরের মধ্যে এত অনাচারের প্রশ্রয়, নিশ্চয় কম হয়ে যাবে।

সিদ্ধেশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে অনাচার বুঝলে ?

বৃন্দাবন বলিল, কোন্‌খানটায় এর অনাচর নেই তাই বলুন, খাদ্যে অনাচার—ব্যবহারে অনাচার—কেউ বাড়ী ব'য়ে দেখা করতে এসেছে, এক মুহুর্ত্তের জন্যও, মেয়ে দিকে একটুখানি ওম্নি ফিট্‌ফাট হয়ে নিতে হবে···যেন একটা দোকানদারী কাণ্ড! যদি মাল দেখে পাছে খদ্দের ফিরে যায়।···বর্ত্তমান, আমাদের এই রিফর্মড্ সমাজটাই যেন ভণ্ডামি আর ন্যাকামির একটা কারখানা হ'য়ে পড়ছে, উদারতার নামে কত বড় উচ্ছৃঙ্খলতা যে এর চারি ধারে আবর্জ্জনার মত জমে উঠ্‌ছে···দু দিন' পরে জাতির শ্বাসরোধ হয়ে যাবে, বলে রাখলুম—তার চাইতে বামুনের গোঁড়ামীও ঢের ভালো, সেখানে ছুঁৎমার্গের একটা শুচিবাই আছে স্বীকার করি, কিন্তু পর দেশের বোটকা গন্ধ নাই।

বৃন্দাবনের সমস্ত কথাবার্ত্তায় এই একটা স্পষ্ট সুর ধরা পড়িল, সংসারে উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার আমদানী মোটে পছন্দ করেন না। স্ত্রী-জাতির দিকেই তাঁর ক্রোধটা কিছু তীব্র বলিয়ই অনুমিত হয়—তাই, একবারে সনাতন সমাজের ধারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে বিদুষী ও অশিক্ষিতার বিশেষ কিছু শ্রেণী বিভাগ নাই। এক হাত ঘোমটা টানিয়া রন্ধন শালায় বসিয়া এই কথাটাই প্রমান করিতে হইবে—"স্ত্রীষু ন-স্বাতন্ত্রমর্হতি।"

একটা ঘৃণ্য সরীসৃপ কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিলে যেমন মানুষের অবস্থা হয়—অমিতার অবস্থাটা প্রায় সেইরূপ দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল বুকের উপর কে একখানা বিশ মন ভারী পাথর চাপাইয়া দিয়াছে, দম আটকাইয়া যায়—ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট প্রকাশ্যে অপমান কিম্বা পদাঘাত

সহিলেও একটা সান্ত্বনা পাওয়া যাইত। প্রভাকে ডাকিয়া বলিল, "ঠিক ব'লেছিলি সই, তখন তোর কথায় রাগ করতুম, কিন্তু একবারে স্পষ্ট সত্যি কথা—তাদের ইচ্ছার দ্বারে, আমাদের একবারে—ক্রীতদাসী করে রেখে দিয়েছে! সোহাগ যা দেখায়—কাম প্রবৃত্তিতে চরিতার্থতার একটু আনন্দ পাব ব'লে···তারপর—যে বয়সে সে প্রবৃত্তিটার বেগ মন্দীভূত হ'য়ে আসে—তখন নিজেদের কুৎসিত নিলর্জ্জতাটাকে দেখাতে একটু লজ্জিত হয় না···একবারে চক্ষুলজ্জা বিহীন!

প্রভাও শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "এক দিনেই বলেছি ত ভাই, আমাদের ভাতের কাঙাল করে রেখে মনুষ্য নামের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"

অমিতা খানিক গুম থাকিয়া বলিল, আমাদের বুদ্ধির—জ্ঞানের মর্য্যাদার কোন দাম নেই?

প্রভা বলিল,—কোন দাম নেই, এক দাম আছে—সে জুতা, নতুন থাকলে চকচকে অবস্থায় দুদিন প্রভুর পদ সেবার যোগ্য থাকবে, একটু চীর দেখা দিলে—কোথায় পড়ে থাকবে তার ঠিকানাই নাই!

"আচ্ছা" বলিয়া মনের ভীষণ সংকল্পটার ধারে, সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিল, ভাবিল, যদি কোন দিন কৃতকার্য্য হই, তবে প্রভাকে দেখাইব সুযোগ পাইলে এই পদদলিতা নারী—সেও জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ইহারই কয়েকদিন পরে একদিন প্রচার হইতে শোনা গেল, বৃন্দাবন নব-নির্ম্মিত বাড়ীটীতে একটা টোল বসাইবার কল্পনা করিয়াছেন, অধ্যাপক রূপে ভাবী জামাতার সেইখানে রাজত্ব চলিবে। এবং শুভ বৈশাখের প্রথমেই তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিলের টাকা আদায় করিতে আসিয়া নরোত্তমের সহিত বৃন্দাবনের কয়েকটি বন্ধুর আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, নরোত্তমের ইচ্ছা ছিলনা তাহাদের সহিত তর্ক করে, কিন্তু অনুকূল মতের লোকও একটী পাইল, তিনি আর্টিষ্ট, কাগজে চিত্রে, যদিও তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-কলার পক্ষপাতী, প্র্যাকটিকাল জীবনে তিনি একজন ঘোর নব্যতন্ত্র মার্গী।—

অন্যান্য ভক্ত অনুরক্তদের মত তিনিও একজন এই পাড়ার প্রভাতিক চা সভা বিহারী, বৃন্দাবন এখনও আহ্নিকে জপে, তপে নিমগ্ন হইয়া আছেন। ইহারা এখানে টিকা কলিকা ও তামাকের শ্রাদ্ধ সারিয়া যাইতেছেন। বেলা প্রায় সাত আটটা বাজে, কথাটা আরম্ভ হইয়াছিল এইরূপে—আর্টিষ্টকই বলিয়াছিলেন,—মানুষের যখন অভাবের প্রয়োজন কমিয়া আসে, তখন সে নিজের গরজে অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে, জগতের ধর্ম্ম নীতি কাব্য যা কিছু বলো, এই অকাজের খেয়াল।

এইটুকু মাত্র কথার সূত্র ছিল, তাহার পর পল্লবিত হইয়া সেটা এমন সঙ্কটের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তেজচন্দ্র আদি করিয়া গোঁড়াদলের পক্ষপাতিরা প্রায় মারমুখো হইয়া উঠিয়াছেন। কয়েকজন টিকিদাস ভট্টাচার্য্য এই আসরে কয়দিন হইতে আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও শুদ্ধ কোমর বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের মেরুদণ্ড ইহ জগতে সিধা হইয়া উঠিবে কিনা—সেটা চিকিৎসা বিদ্যার গবেষণীভূত!—

নরোত্তম কেবল এই কথাটি বলিল,—আপনাদের সমস্ত বিতর্ক মাথাপেতে নিলুম। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আদি ও অকৃত্রিম, এবং সর্ব্বগুণ

সম্পন্ন, তার জাতিরপাতি ইত্যাদিতে বড় রকম একটা আধ্যাত্মিকতা আছে, আমিও ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতার গুমরটা খুব বুঝি, কিন্তু বুঝিয়ে দিন, মুখে একরকম এবং কাজে আর একরকম করবার ব্যবস্থা এর কোন পৃষ্ঠাতে আছে? ঠিক সত্যি নিয়েই যদি নাড়া চাড়া চলতো—তবে আর এক মুহূর্ত্ত কারো ওকালতিতে কি ব্যবসাতে বেড়্না চলতো না। ঠিক সত্যি নিয়ে চলা বড় শক্ত কথা! বড় আইডিয়া আমাদের মাথায় অনেকের আছে; তাই বলে সেই আইডিয়া অনুসারে চলবো—এ দম্ভ প্রকাশ করা নিতান্ত বাতুলতা—তাতে বুদ্ধিহীনতা মাত্র প্রকাশ পায়।"

আর্টিষ্ট হাত তালি দিয়া বলিল,—"ঠিক বলেছেন বাই জোভ্! ছবিতে কতসময় আমরা নিবিড় জঙ্গল—তার মধ্যে পথহারা নারী এঁকে দেখাই, তাই কি সত্যি; গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে কেউ একবেলা বেঁচে থাকতে পেরেছে? তা ছাড়া এই ধর্ম্ম জিনিষটাই একান্ত অনাবশ্যক সৃষ্টি···মানুষের অবাধ গতি চাঞ্চল্যতে এ জিনিষটা, যত বাধা দিয়েছে এত আর কিছুতে নয়। রাজার শাসনও ধর্ম্মের অনুশাসনের নিম্নে গিয়ে পড়েছে।"

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তেজচন্দ্রও নাস্তিকদের সঙ্গ অপেক্ষা, রাখাল বালকের সঙ্গ অধিকতর প্রীতিকর বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

নরোত্তম মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখুন আপনারা চটে উঠ্বেন না এই দেশেই—এই কলকাতার কিছু দূরেই নাস্তিক কপিল, সাগর সঙ্গমের দ্বীপে বাস করতেন, তিনি জীবনটাকে ভোগ সম্ভোগ আর —কর্ম্ম তৎপরতার দিক হ'তে দেখতে চেয়েছিলেন, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারটাই চরম ব'লে মেনে নিতে পারেননি, তিনি বলেছিলেন—

"অসংখ্য বন্ধনময় মহানন্দ মাঝে—
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

তেজচন্দ্র একটা হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কতকগুলো ব্রেম্ম-জ্ঞানী ছোঁড়া জুটে সমাজটাকে একবারে মাটী ক'রে দিতে বসেছে, ছ্যাঃ……

শব্দ-তরঙ্গের ছটা ক্রমশঃ অন্তঃপুরে ধ্যানরত বৃন্দাবনকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। খড়মটা মাত্র পায়ে দিয়া সে বাহিরে বাহির হইয়া আসিল, নেপথ্য হইতেই বলিতেছিল—"এতটা ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকির কারণ কি জন্য—হে ?…

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিন্তু তাহার কথার স্বচ্ছন্দ গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। নরোত্তমের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনার কি দরকার ?" নরোত্তম এ সম্ভাবনাটা অনুমান করিত… পকেট হইতে বিলখানা বাহির করিয়া বলিল,—"কিঞ্চিত প্রয়োজনের তাগিদও ছিল বৈ-কি…নইলে, বিনা কারণে কে কার দুয়ারে এসে ধন্না দেয় বলুন ?"

"অঃ"—বলিয়াই পৈতার সঙ্গে বাঁধা আয়রণ-সেফের চাবিটা দিয়া সেফটা খুলিয়া ফেলিয়া, পাই পয়সা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "নিয়ে যান।" বৃন্দাবনের তখন নরোত্তমকে এই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিতেও কেমন অসহ্য বেদনা বোধ হইতেছিল। সে যে অমিতাকে সঙ্গে করিয়া কোন অছিলায় বাহিরে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সে সংবাদটাও তাহার কাছে ছাপা থাকে নাই।

আর আর সকলে উঠিয়া গেল, কেহ বা বাহিরে একটু জটলাও পাকাইতে লাগিল, নরোত্তম তখনও উঠিল না। চেয়ারটাতে বসিয়া দিব্য সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

বৃন্দাবন অসহিষ্ণু হইয়া বলিল,—"আর আপনার কি প্রয়োজন আছে বলুন?"

নরোত্তম হাসিয়া বলিল, "আপনার কি এতে কিছু অসুবিধা বোধ হচ্ছে?" কিছুমাত্র বৃন্দাবনের উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া আবার বলিল, —"তাহলে আমার বক্তব্যটা বলেই যাই; আপনার সম্বন্ধী সিদ্ধেশ্বর বাবু আমায় বলে দিয়েছিলেন, তাঁর ভাগ্নীটিকে আপনি নাকি—সরস্বতী পাঠশালায় পাঠাচ্ছেন। তিনি বলছিলেন, দুটো সাঁজ-পুজুণী, কি ইতু কথা, শেখাবার জন্যই মেয়েকে পাঠশালে পাঠানো হয়নি।

বৃন্দাবন চোখ-দুটা রক্তবর্ণ করিয়া অন্ধভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কয়দিন হইতে নাগাড় এই কথাটাই শুনিয়া আসিতেছিল, যে পথে সে নামিয়াছে তাহা ভ্রান্তির পথ। ভ্রান্তি হোক, —উচ্ছৃঙ্খলতা—হোক, তার কাজ সে নিজেই বুঝিবে, বাহিরের হিতৈষীদের উপদেশ দিয়া মাথা গরম করিবার কি আবশ্যক? বিশেষ এই সব গায়ে পড়া হিতৈষীদের বৃন্দাবন যেন দুর্গ্রহের মত দেখিতেছিল।

নরোত্তম আবার পা-দুকাটাকে নাচাইতে নাচাইতে বলিল,— "আর জানেন ত—বাতে তিনি একরকম চলৎশক্তি রহিত হ'য়ে পড়েছেন, অতি কষ্টে আফিস যান মাত্র, বলছিলেন···

অসহিষ্ণু হইয়া বৃন্দাবন বলিল, "কি বলছিলেন তাই শুনি।"

নরোত্তম নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবে বলিল,—"বলছিলেন এ অন্যায় হচ্ছে···বিশেষ মেয়েটির নিতান্ত কাঁচা বয়স।"

বৃন্দাবন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল,—কাঁচা হোক পাকা হোক্, আমার মেয়ের ভাল মন্দর খবর আমিই বুঝি, তাঁদের এ লোক পাঠিয়ে—দৈত্যো-রকম কৈফিয়ৎ নেবার উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারিনে, কন্যার পিতা তাঁরা নন, কন্যার পিতা আমি!"—

"সেই সঙ্গে যদি আমি সন্দেহের অবসর না দেই—"...

স্ক্রীনের আড়াল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে অনাহুত বিদ্যুৎ শিখার মত প্রবেশ করিয়া অমিতা ঐ কথা বলিল, স্পষ্ট মুক্ত কণ্ঠে আবার বলিল,..."যদি প্রথমতঃ আমি তা স্বীকার করি..."অমিতাকে দেখিয়া নরোত্তম শীলতা রক্ষার খাতিরে উঠিয়া যাইতেছিল—অমিতা তাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলিল, "আপনি উঠে যাবেন না—বসুন, আজকে আমাদের দুজনা-কার মধ্যে একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যাক। আমি এতক্ষণ আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলুম। দাদা অবশ্য ভালর জন্যই, তাঁর আশীষদের দ্বারা কথাটা বলে দিয়েছিলেন, তার উত্তর দেওয়া হোল কিনা—মেয়ের বাপ তারা নয়—উনি।......নরোত্তম বাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আমি যদি বলি মেয়ের-মা,...মেয়ের বাপ তুমি নও...ইনি,—তাহলেও তোমার কি জাবাবদিহি থাকতে পারে?"—

বৃন্দাবন আয়রণ-চেষ্টটা ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনি বজ্রা-হতের মত স্তম্ভিত বাকশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত দিবালোকের দীপ্তি যেন ছায়ার মত ম্লান হইয়া আসিল। মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কাণের কাছে অমিতার এই কথাগুলাই পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কথাগুলা যেন বিভীষকার মত মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিল। এ সময়ে যদি বৃন্দাবনের হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া অচল হইয়া যাইত—বৃন্দাবন মনে করিল তাহা হইলে এই অপমানের আঘাত হইতে সে বাঁচিতে পারিত। নরোত্তমকে দেখিল, তখনো সে জানোয়ারটা চেয়ারটাতে তেমনি মিটি মিটি সয়তানের মত বসিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে, বৃন্দাবন বুঝিল, আর কিছু নয়—এই সমস্ত সয়তানদের এটা চক্রান্ত মাত্র, নইলে সাধ্য কি

অমিতার মুখ দিয়া এই কথা বাহির হয়? নরোত্তম তাহার মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিয়া লইবে বলিয়া বসিয়াছিল—তাহারই সম্মুখে তাহার কথা বলাইয়া লইল—তবে ছাড়িল। তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন একটা আগুনের হল্কা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণের পর, নরোত্তম কতকটা সান্ত্বনা দেওয়া—বনাম ব্যঙ্গ করার ছলে বলিল, "যান্ বৃন্দাবন বাবু মেয়েমানুষের কথায় কি দাঁড়িয়ে ভাবছেন?" অমিতাকেও কৃত্রিম একটু তিরস্কার করিয়া বলিল, "জানো অমিতা তুমি হিঁন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার পক্ষে—এসব কথা মোটেই শোভা পায় না, এতে তোমার সতীধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় বলেই মনে করি; আমরা, আমাদের ধর্ম্মে—সমাজে, কপটতার প্রশ্রয় মোটে ভালবাসিনে—যতটা ভালবাসি সত্যের সহজ, সরল, আবাহন—

কাজ হইতেছে মনে করিয়া এবং বৃন্দাবনকেও ভিজাইতে পারিয়াছে ভাবিয়া স্বর আরও মৃদু করিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনের নিতান্ত কাছে গিয়া যেন অমিতার হইয়াই ক্ষমা প্রার্থনার ছলে বলিল,—"জানেন ত স্ত্রীলোকের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়···ওর যদি সেই বুদ্ধিই থাকবে, তবে এই সামান্য কথায় ঝগড়া বাধাতে আসে? লেখাপড়া শিখলে কি হবে? সে কেবল পাখীর মত পড়া বুলীই মুখস্ত করেছে; একটু যদি বিচার ক'রে কথা বলতে শেখে—শুধু উত্তেজনায় কাজ হয় না অমিতা—কাজ আদায় করতে গেলে ধৈর্য্য চাই! ক্ষমা চাই···তিতিক্ষা চাই...এমন কি নিন্দা ভ্রুকুটিকে পর্য্যন্ত হজম করা চাই!···

উত্তেজনার পর অবসাদ আসিয়াছিল বলিয়া, অমিতাও একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। আর ভাবিতে ছিল মুখের ঘোমটা খুলিয়া দরিয়াতে ত ঝাঁপাইয়া পড়িলাম···পরিণাম যাই হোক।

বৃন্দাবন সিন্ধুকের ঠেশ ছাড়িয়া কাছের ইজি চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িল,

খানিক ঝিমাইয়া রহিল, তারপর নরোত্তমের দিকে মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত কষ্টকর কণ্ঠে বলিল—

—আর তোমার ভাণ্ডারে কিছু আছে নরোত্তম বাবু? আগে থাকতে তৈরী হ'য়ে এসেছিলে, তা বুঝতে পাচ্ছি, এখন জিজ্ঞাসা করি…আর কিছু বলবার আছে?

নরোত্তম বিস্মিত হইয়া বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃন্দাবন বলিল…আর ছলা কলাতে কাজ নেই নরোত্তম, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে…তোমাদের মা বাপের লেখা পড়া শেখানো সার্থক! বিদ্যে যদি শিখতে হয় এই চমৎকার বিদ্যে—একটা মানুষের সাজানো সংসারকে আবর্জ্জনার কুণ্ডে ফেলে দেওয়া, ওঃ—

দুই হাতে বৃন্দাবন মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

নরোত্তম অত্যন্ত থতমথ খাইয়া যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে এই ভাবে বলিল, "একি?—অ্যাঁঃ—বলেন কি?"

বৃন্দাবন গভীর ক্ষোভ-ক্ষিন্ন-কণ্ঠে বলিল, ভূমিকার আর প্রয়োজন নেই নরোত্তম, তোমরা জয়ী হ'তে পারবে, তা জানতাম, কারণ বয়স কাল তোমাদের পক্ষে আছে, তা জেনেও আমি বিশেষ কিছু বলিনি, জানতাম নারী তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হ'তে সহসা নেবে পড়বে না, এখন দেখছি সে ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে, তার চরম অধঃপতন। যদি তোমার বিন্দুমাত্র আমার পরে শ্রদ্ধা থাকে তবে মিনতি কচ্চি… আর এখানে তুমি এসো না…যাও।

বাহিরের লোকদের আগমন আশঙ্কায় বৃন্দাবন নিজেই নরোত্তমকে বাহির করিয়া দিয়া বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল—জানালা গুলাও বন্ধ করিয়া দিল, যেন বাহিরের আলো মোটে তাহার সহ্য হইতেছিল না।

অমিতা আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে একলা বৃন্দাবন দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল—আজ তাহার ঘর হইতে এত বড় একটা সম্পত্তি লুট হইয়া গিয়াছে, টাকা পয়সাতে যাহার স্থান পূর্ণ হইবার নহে। নিজের বুকের উপর একটি মণি-হারকে যে ডানা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, কাল-বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় তাহা ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে।

নেত্য-ঝি কলরব করিয়া পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা মা, ব্যালা যে সাড়ে এগারটা বাজতে চল্‌লো—বাবু কি আজ কাছাড়ী যাবেন না? পিসীমা রান্না সারিয়া হাতে মালাগাছটি লইয়া জপে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, একবার খবর নিয়ে আয় দেখি নেত্য—

সে খুব সন্তর্পণে বাহিরের মাঝের ঘরটা উঁকি দিয়া দেখিয়া তারপর অত্যন্ত সংগোপনে পিসীমাকে গিয়া বলিল, "বলি হাঁ পিসীমা, বাবু এমন-ধারা মুখ লুকিয়ে চেয়ারে ব'সে দুহাতে চোখের জল পুঁছচেন কেন?"

পিসীমা বলিলেন, "বোধ হয় রাক্ষসী তাকে দংশেছে, আর কোন কারণ নেই।" তখন তিনি উদ্দেশে রাক্ষসীর মুখে অগ্নি সৎকার করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিতে আসিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র কিন্তু ক্ষুধার অভাবের কথাই বারম্বার জানাইল। তবু উঠিয়া আসিতে চাহিল না।

উপর হইতে অমিতা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—ঢং দেখে আর বাঁচিনে, এত অভিমান এদ্দিন কোথায় ছিল গো?—

পিসীমা কাছে আসিয়া স্নেহভরে হাতের মালাটি, বৃন্দাবনের মাথার উপর ঠেকাইয়া দিয়া বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তোর কোন বালাই থাকবে না। তুই যখন ব্রাহ্মণের ছেলে তখন তোর কিসের বালাই? স্বয়ং ভগবান একদিন এই ব্রাহ্মণের দোরে মাথা লুটিয়েছিল। এত তার তেজ...সামান্য মেয়ে মানুষের কথায় তোর অভিমান হয়?

দৈত্য অস্ত্রে হতচেতন দেব শিশুর মত মৃত-সঞ্জিবনী স্পর্শে বৃন্দাবন জাগিয়া উঠিল, আপন মনেই কয়েকবার ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! বলিয়া আপনার সাড়া লইল। বুঝিল ব্রাহ্মণ আছে, তার তেজের কাছে উদ্যত-ফণা সর্প-রাজ বাসুকীকেও মাথা অবনত করিতে হইয়াছিল, সামান্য এই রূপের সর্পিণী তার কাছে কি তুচ্ছ··· !—

দশম পরিচ্ছেদ

ঝি এবং সরকারে কথা হইতেছিল, অবশ্য সরকারের ঘরে বসিয়াই। ঝি সরকারকে বাজার খরচের হিসাবের বুঝ দিতে গিয়াছিল, সরকারও সেই মাত্র নতুন বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল।

সরকার, ঝি নেত্যকে বলিল, "হাঁ নেত্য—তোরা যে বলেছিলি আমাদের হবো জামাইটির পেট জোড়া পিলে—তা ত নয়। পাড়া-গাঁয়ে থেকে মানুষের গায়ের রং এতটা উজলা থাকে, তা তো মনে করতে পারা যায় নি, খাসা জামাই হবে, হাজার হোক আমাদের বাবুর পছন্দ···"

কথাটার কিয়দংশ ঝড়ে উড়িয়া, কি রকম ঠিক উপরের বারান্দায় পাঠনিরতা রেখাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। সে পাঠ ভুলিয়া আনমনা হইয়া নীচের ঝি ও সরকারের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল।

ঝি নেত্য একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমরা সব কি ক'রে জানবো বলুন।—আপনাদের বিবি সাহেবকে বলুন, তাঁর বন্ধুরা তাঁর গলা ধরে খবর দে গেছিলেন যে—পাত্র ভাল নয়। বন্ধুরা যখন বলেছে তখন তা কি

মিথ্যে হ'তে পারে? বাবু নিজে দেখে এলেন, সেটা মোটেই সত্যি কারের নয়। আজ সব তাঁরা এলেন বুঝি?"

সরকার বলিল, "না কালই তাঁরা এসেছেন, চিঠি লেখা ছিল, আজ সব বন্দোবস্ত দেখতে গিয়ে ছিলুম।"

নেত্য জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ নতুন বাড়ীতেই তাঁরা উঠ্‌ছেন?"

নফর বলিল—"হাঁ"।

নেত্য বলিল, "আমাদের জামাইএর সঙ্গে আর কে কে এলেন?"

নফর। তাঁর এক দাদামশাই, সে বুড়োটাও ভারি পণ্ডিত, তাঁর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। যেন একখানা আগুনের কড়াই। তাঁর পৈতাগুলিরও কি ছিরি, আমি আজ তাঁদিকে এমন ভক্তিভরে প্রণাম করে এসছি, এতটা ভক্তি নিয়ে প্রণাম কাউকে করেচি বলে মনে হয় না।

নেত্য মুখটা বাঁকাইয়া বলিল—"তবুও আমাদের বৌরাণী বলবেন, "টুলো পণ্ডিতের হাতে মেয়ে দেব কি?—মেয়ে দেব ব্যারিষ্টার ছেলে দেখে—কি জজ-সাহেব দেখে—মাগো টুলো পণ্ডিত নাম শুনলে ঘেন্নায় মরতে ইচ্ছে যায়। বলি হাঁগা দাদাবাবু টুলো পণ্ডিতের কি কোন দাম নেই?"

নফর হাসিয়া বলিল, "এককালে খুবই দাম ছিল, আজকাল অন্য রাজার আমল—তাই যা বলো, কিন্তু শোনা আছে, কোন জন্মে ওঁরা পয়সা নিয়ে বিদ্যে বিক্রি করেন নি, বিদ্যা দানই করে এসেছেন বরাবর।"

সহসা উপরের দৃঢ় পাঠ-নিরতা রেখার বইখানা হাত ফস্কাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। রেখার চমক ভাঙ্গিল। নেত্য উপরের দিকে মুখ তাকাইয়া বলিল "কার বই পড়লো? আমাদের লক্ষ্মী রেখার—তা দাঁড়া ভাই, তোরই বরের কথা কইছিলুম, তোর বইখানি তুলে দিয়ে আসি।"

রেখা তাহাকে ছোট রকম কীল উচাইয়া বলিল,—"উপরেই তুই উঠে আয়।"

নেত্য তাহার কাছে উঠিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ নেত্য দি, বাবা কোথায় বেরিয়ে গেছেন?

আর সে পূর্ব্বের মত প্রগলভা নাই, স্বরেও তাহার যথেষ্ট কোমলতা ও ধীরতা দেখা দিয়াছে, এ যেন দু মাস আগেকার সে রেখা আর নয়,—কোন্ নিপুন শিল্পী এক রাত্রের মধ্যেই তাহাকে অন্য ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে। নেত্য জানিত এখন সে তাহার বিবাহের কথা বুঝিতে পারে, লজ্জা জাগিয়াছে। বলিল—"বাবা তোমার জামাই বাবুর তদারকে বেরিয়ে গেছেন।

"দেৎ" বলিয়া রেখা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। নেত্য চারি দিক চাহিয়া কেহ নাই দেখিয়া এক মুখ হাসিয়া বলিল, দেৎ করবার কিছু নেই দিদিমণি, এ তোমার আধকুঁজো—চোখে ছানি পড়া, কলেজের ছোঁড়া গুণো চাইতে ঢের ভালো, সরকার মশাইএর মুখে যে রকম শুনলুম, সরকারের মুখে না শুনলেও আমি জানি আমাদের জামাইবাবুটি ভালই হবেন, কারণ বাবুর পছন্দের কি কোন দাম নেই? ভারি সুপুরুষ দিদি—আমাদের কোচায়ানটাও সেই কথাই বলছিলো।"

উৎফুল্ল হইয়া নতমুখে রেখা তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া কথাগুলা গিলিয়াই যাইতেছিল, একটি অনুস্বর বিসর্গ অবধি বাদ দিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সহসা কঠোর কণ্ঠে পাশের ঘর হইতে মায়ের গলার শব্দ শ্রুত হইল। মা বলিলেন...রেখা, তুই নেত্যর কাছ হতে হাঁ ক'রে কি শুনছিস্ রে?—

বাহিরে বাহির হইয়া আসিয়া অমিতা নেত্যকেও কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—তুই মেয়েকে কি শোনাচ্ছিলি।"

নেত্য থতমত খাইয়া বলিল—কি আর শোনাবো মা, আমার সইএর বেগুণ ফুল—তার বোনপোকে দেখতে খিদিলপুর গিয়েছিল, পথে একখানা গাড়ী তার উপরে পড়ে গেছিল, আর একটু হ'লে সে মারাই যেতো। তা বাঁদীর কপালে শিগ্‌গীর মরণ থাকবে কেন বলো ?...ও রেখাদি, বইটে যে তোমার এখনো শুকুলো না ভাই ?...এই বইখানা পড়ে গিয়েছিল মা—আমি কুড়িয়ে এনে দিলুম। ছবিগুলিও ত খাসা।

অমিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুঝিল, ঝি নেত্য...কথা দিয়া কি একটা চাপিয়া যাইতেছে, অমিতা শুনিয়াও ছিল, নূতন বাড়ীতে হবো জামাইএর দলের আমদানী হইয়াছে। নেত্যকে সাবধান করিয়া দিল—দ্যাখ্ নেত্য, রেখার কাছে ও বাড়ীর গল্প-সল্প যেন কেউ না শোনায়, বুঝলি ?...

নেত্য এক হাত জিভ বাহির করিয়া বলিল—মা গল্পই জানিনে তা গল্প করবো ? কখন আমরা কি আর ও ছাই ভস্ম জানলু, গল্পের বই কেবল তোমরাই পড়ো, তোমরাই তার মজা পাও, আমাদের কাজ করতেই দিনে কুলোয় না তা গল্প করবো ? হায় মা, হায় !—গভীর একটা আক্ষেপ উক্তি করিয়া নেত্য চলিয়া গেল।

অমিতা বৃন্দাবন বাড়ীতে নাই ভাবিয়া, টেলিফোনে নরোত্তমকে ডাকিয়া পাঠাইল। নরোত্তম টেলিফোঁনেই জবাব দিল, "আমরা প্রস্তুত হইয়াই চলিতেছি, তোমার ভাবনার কারণ নাই।" দিন ক্ষণ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা পাইল না। অমিতারও তা দরকার ছিল না।

বৈকালের দিকে নতুন বাড়ী হইতে খবর আসিল—বাবু বলিয়া পাঠাইয়াছেন, রাত্রে নতুন বাড়ীতে এক হোম হইবে বাড়ীর সকলকারই সে হোমের সময়ে উপস্থিত থাকা চাই। অমিতা বলিল—"বেশ..." সে সন্ধ্যা বেলাতেই গায়ে চাদর মুড়ি দিয়া, জ্বর হওয়ার নাম করিয়া

শুইয়া রহিল। তাহাকে তুলিতে কাহারও সাধ্যে কুলাইয়া উঠিতে পারিল না।

পিসীমা পেছনে যেমন বরাবর বলিয়া থাকেন, আজও বলিলেন "লেখা পড়া শিখে অনেক মেয়েকে ধিঙ্গি হতে দেখেছি মা, এর মত কাউকে দেখিনি, দেব, দেবতা, দেবালয় হোম যজ্ঞি কিছুতে বিশ্বাস নেই। এ খৃষ্টাণ মেয়ের গতি কি হবে? ওরে পোড়াকপালী, তুই এ ভব-সমুদ্র কিসে তরে যাবি?"

কথাটার কতক অমিতাকে স্পর্শও করিল, কিন্তু এ সব বাজে জিনিষের উপরে বরাবর যেমন অশ্রদ্ধা দেখাইয়া আসিয়াছে, তেমনি আজও অশ্রদ্ধা দেখাইয়া—পাশ বালিশটাকেই বেশ করিয়া পাশে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল। তারপর যখন সবাই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, তখন উঠিয়া বসিল।—এবং সুইসটা টিপিয়া দিয়া, সন্ধ্যাবাতি জ্বালাইয়া দিল। তুলসীতলায় তৈল দিয়া প্রদীপ দেখানোর ভারটা এখন বিজলী বালাই গ্রহণ করিয়াছে।

কয়দিন হইতে অমিতা স্বামীর ঘরের সম্পর্ক চোকাইয়া ছিল। সেই জন্য এই ঘরটি মাত্র ছিল তাহার একমাত্র অবলম্বন স্থল···ইহার প্রত্যেকটি জিনিসের সহিত সে কথা কহিত, ইহার বই, কাপড়ের আলনা, দেওয়ালের আয়না—সবাইকে সে মনের কথা বলিত, তারাও অমিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিত এদিন তোর থাকবে না। আবার তাহাদের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু সামনের আকাশের তারাটা অত্যন্ত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া তার সব যেন প্রশ্ন ভোলাইয়া দিতে লাগিল। তারা-লোকের এতটা দীপ্তি যে থাকিতে পারে তাহা অমিতার বিশ্বাস হয় নাই, আজ হঠাৎ এই কথাটাও তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইল। তাহার মনে হইল নক্ষত্র লোক

হইতে একটা উজ্জ্বলতম দীপ্তি তাহার বক্ষের উপরেও আসিয়া পড়িতেছে, পুঁথির লেখার সে সত্য হইতে যে—এ সত্যের ঢের বেশী দাম। কোথায় যেন কি একটা গোল বাধিতে লাগিল—তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা ঘরে গিয়া—রিং বাজাইতে লাগিল, টেলিফোনে জবাব আসিল—কে ?

উত্তর হইল—আমি অমিতা !—

"অমিতা—কি জন্য ডাকো ?"

"একবার শীঘ্র তোমায় প্রয়োজন আছে নরোত্তম বাবু।"

"বেশ"...

* * * *

সেই রাত্রে ভবানীপুরের নূতন বাড়ীতে হোমের আয়োজন চলিতেছিল। বাড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে একটা কুণ্ড কাটিয়া অগ্নির স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছিল। রাশি রাশি ঘৃত, বিল্বদল, সেখানে স্তূপীকৃত হইতেছিল, যজ্ঞক্ষেত্রে ঋত্বিক ছিলেন—স্বয়ং অধ্যাপক ও ভাবী জামাতা, পঞ্চশিখ বিদ্যারত্ন, আচার্য্যের পদে বসিয়াছিলেন, পঞ্চশিখের মাতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত রামচন্দ্র তর্ক-চূড়ামণি।"

ঘন ঘন প্রণব ও বেদমন্ত্রে সমস্ত বাড়ী যেন কথা কহিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র যজ্ঞ-হবির গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। এ সময় এখানে মনে সাত্বিক ভাব ছাড়া, আর কোন ভাবের উদয় সম্ভব-পর ছিল না। পিসীমা কিন্তু জপে বসিয়াও মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন,—"যে সব চাইতে নাস্তিক, সেই একবার এলো না গা—এলে—এই সব দেখ্‌লে, তার পাষাণ প্রাণেও ভগবানের গন্ধ পৌঁছুত !"

বৃন্দাবন কতকটা ক্ষোভ-ক্ষিন্নস্বরে বলিল, "কেন পিসীমা তার নাম কচ্চো? তার চাইতে ঈশ্বরের নাম নাও যে কাজে লাগবে। সে এতক্ষণ নবেল নিয়ে হা—হা ক'রে ঘুরে মরচে, দেখগে—"

আহুতি দিবার বেলায় ঋত্বিক কর্ত্তৃক বৃন্দাবন যখন আহূত হইলেন, তখন বৃন্দাবন, কন্যা রেখাকে সঙ্গে লইয়া দাঁড়াইল, রেখার পরনে লাল বেনারসী পট্টবস্ত্র ছিল। ঠিক তাহাকে যেন বিবাহের ক'নেটির মতই দেখাইতেছিল, পিসীমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, আহা এ রূপ—মেয়ের—মা একবার চ'ক্ষে দেখ্‌লো না গা—"

ঘৃত-সিক্ত এক একটি জবা লইয়া পিতা পুত্রিতে অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইল, পঞ্চশিখ মন্ত্র পড়াইতে লাগিল, গভীর রাত্রে তাহাদের প্রত্যেকটি মন্ত্র-কথা জীবন্ত হইয়া যেন আশে পাশের সমস্ত চরাচরের অশিব গ্লানি—স্বাহা শব্দে লয় প্রাপ্ত হইল।

আহুতি কর্ম্মের শেষে বৃন্দাবন বৃদ্ধ রামচন্দ্রের কাছে তাহারও একটা নিজস্ব যজ্ঞ ক্রিয়ার জন্য অনুমতি চাহিল।

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনার কি ক্রিয়া আছে সমাধা ক'রে নিতে পারেন।

বৃন্দাবন তখন পঞ্চশিখকে রেখার পাশে আসিয়া বসিতে বলিল, পঞ্চশিখ, একবার মাত্র তাহার দাদামহাশয়ের দিকে তাকাইয়া, তাঁহার অনুমতিটি লইয়া রেখার পার্শ্বেই বসিল। বৃন্দাবন তখন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। মন্ত্র একবার কন্যার মুখ দিয়া বলাইল, আবার পঞ্চশিখের মুখ দিয়াও বলাইয়া লইল। সাক্ষী রহিল ব্রাহ্মণ আর বৈশ্বানর···পিসীমাও স্থিরনেত্রে এই দুটী যুগল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।—স্তব্ধ রাত্রে এই দুটী কিশোর কিশোরীর আবাহন মন্ত্র যেন সমস্ত আকাশ, বাতাস, চরাচরকে, প্লাবিত করিয়া গেল।

ওঁ নিধিনাম ত্বা—নিধিপতিং হবামহে

ওঁ প্রিয়ানাম ত্বা—প্রিয়পতিং হবামহে।

বৃন্দাবন রেখাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—বলোমা—"এসহে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়পতি তোমায় আমি আবাহন করি—এসহে নিধির মধ্যে নিধিপতি তোমায় আমি অন্তরের মধ্যে বরণ করি।"—এই আত্ম নিবেদন মন্ত্রে রেখার সমস্ত হৃদয়, অপরূপ এক মাধুর্য্য রসে ভরিয়া উঠিল। তাহার অশ্রু পল্লবও সিক্ত হইল, মন্ত্রের এত শক্তি তাহা সে জানিত না। পঞ্চশিখের বলিষ্ঠ, সুন্দর—দিব্য কান্তিময় মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ঐ কথাটাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

—"এস হে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়পতি তোমায়

আমি আবাহন করি।"—

তাহার হৃদয় পদ্মের প্রত্যেকটি দলে,—ঐ মন্ত্র যেন, অগ্নিমন্ত্রের মত আঁধার দেশ আলো করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রের ঘটনাটা কিছুমাত্র চাপা থাকিল না, অমিতা সকাল বেলাতেই খবর পাইল, বৈদিক যুগের প্রথামত গৃহস্বামী কন্যাকে ভাবী জামাতার কাছে আবাহন মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধপূত করিয়া লইয়াছে; এক রকম তাহাকে বিবাহ বলিতে পারা যায়, শুধু স্ত্রী-আচার আর লৌকিক আচারগুলা মাত্র

বাকী রহিয়াছে, সেটা একটা যে কোন দিনে সমাধা করিয়া লইতে পারা যাইবে।

অমিতা রাত্রে বেলায় নরোত্তমের কাছ হইতে একখানা নব প্রকাশিত চণ্ডীদাস পদাবলী পাইয়াছিল, সেইখানা একান্ত মনোযোগের সহিত তাহার একটা অপ্রকাশিত এবং অপঠিত পদের রসোদ্ধারে ব্যস্ত ছিল, কবিতাটি এই—

"থির বিজুরী- বরণ গৌরী
পেখনু ঘাটের কুলে—
কানাড়া ছান্দে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে—
ফুলের গেরুয়া লুফয়ে-ধরয়ে
সঘনে ধরয়ে পাশ,
উচ কুচ যুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস।"

কবিতাটির প্রত্যেক ছন্দে অমিতা এই কথাটিই ভাবিয়া দেখিতেছিল— কার্য্যোদ্ধারের জন্য চণ্ডীদাসের রাধাকে ছলা-কলার হাত ধরিতে হইয়াছিল, আজকের দিনের বিদুষীরাই মাত্র বেহায়া নয়।

ঠিক এই সময়ই রাত্রের ঘটনাটা তাহার কাণে গেল, অনেক খবর ঝি দিল—কতক নির্ব্বোধ পিসীমা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল— পরিণাম কি দাঁড়াইবে একবার ভাবিয়া দেখিল না।

অমিতা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনীর মত ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, অথচ মুখের ভাবে আপনাকে ধরা দিল না। শুধু ছোট্ট একটা হাঁ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তারপর—

পিসীমা আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, বলবো—তারপর আর কি মা, রেখাকে দেখাতে লাগল যেন গৌরী···আর পঞ্চশিখরকে মনে হ'তে লাগল যেন সাক্ষাৎ বাবা···অনাদিনাথ। রেখার গায়ে, হাতে, একখানি মাত্র অলঙ্কার ছিল না। কি তোমরা গহনার বড়াই করো বউমা, শুধু একখানি লাল চেলিতে যা মানিয়েছিল রেখাকে—অনেক কাল আমার মনে থাকবে।"

অমিতা শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটা পাড়াগেঁয়ে এক অসভ্যর হাতে পড়লে তোমরা খুব খুসী হও, কেমন পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "সুখী অসুখি বুঝিনে মা, তবে এই বুঝি, তোমার সহরের এই বার-ভরঙএর দেশ চাইতে, পাড়া গাঁয়ের মোটামুটি ঢের ভালো, তোমার এ যা জামাই হবে, সহরের মাজা ভাঙ্গা দশটা বাবুকে বোধ হয় ক'ড়ে আঙ্গুলে টিপে মারতে পারবে। তবে লেখাপড়ায় কি কদ্দুর তা জানিনে মা।"

অমিতা ভাবিল, যতই শক্তিধর হউক পাড়াগেঁয়ে ছাড়া, আর কিছুই নয়—তাহা ছাড়া, মাত্র সংস্কৃত বিদ্যাটুকুতে শিক্ষিত। তাহার আশ-পাশের বন্ধু বান্ধবের জামাইদের কথা মনে হইল, তাহারা কেহ বা জজ, কেহ বা ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ বা খুব বড় চাকরী করে, আর এই জামাই ইংরাজীতে বোধমাত্র হীন, তিনি কি করিবেন? খুব বড় চাকরী জোটে, একটা বাংলা ইস্কুলের পণ্ডিতি জুটিবে···বেতন হইবে নগদ দশ টাকা!—

অমিতা মেয়েকেও কাছে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল, "দ্যাখ্ রেখা কালকে রাত্রের বেলা···তোর পাগল বাবার পাগলামীর ব্যাপারটা কিছুতে সত্যি ব'লে মনে জায়গা দিস্‌নে,—এতবড় উন্মাদের কাণ্ড বাপ হ'য়ে কেউ করতে পারে?—ও তোকে আবাহন মন্ত্র পড়ান নয়—রেখা, তোর হাতে পায়ে বেঁধে তোকে জলে ফেলে দেবে।"

অমিতার মনে এই ধারণাটা খুব প্রবল হইল, সেদিন মুখের উপর

যে জবাবটা নরোত্তমের সমক্ষে সে দিয়াছিল, তাহারই প্রত্যুত্তর ছলে কন্যাকে লইয়া, একটা ভয়াবহ অথচ কেলেঙ্কারী কাণ্ড গাঁথিয়া রাখিল, তাহার মানে এই যে—জগতের সমক্ষে এই তত্ত্বটা প্রচার হইবে কন্যার মা যতই প্রতিবাদ করুক স্বত্বাধিকারে পিতার স্বত্বই বলত্তর··· এবং তাহার দাবীর কোন মূল্যই নাই।

আবার অমিতার মনে হইল অপমান যদি মুখোমুখি হইত, তাহার অর্থ-বোধে কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু এযে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। স্ত্রীকে স্বামী যতদূর ঘৃণা করিতে পারে তাহার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া তবে এতখানি আচরণ তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে, স্ত্রীই শুধু দাঁড়াইয়া নীরবে এই অপমান হজম করিবে? বুদ্ধির তবে কোন দাম নাই? নারী-রূপের কোন মূল্য নাই? অমিতা প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপমানের প্রতিশোধ তুলিতে যদি পৃথিবীর সমস্ত পাপভার—সমস্ত কলঙ্কের বোঝা, মাথায় তুলিয়া লইতে হয়—তাহাতেও তাহার পশ্চাদপদ হইলে চলিবে না। কারণ এ স্বত্বাধিকারের মামলা, দেখা যাউক, দশমাস গর্ভে ধরিয়া যে নিজের বুকের শোণিত দিয়া পালন করিয়াছে স্বত্ব তার···না জন্মদাতা পিতার—যার স্বত্বের কোন ন্যায় সঙ্গত কারণই নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সিদ্ধেশ্বর আক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছিলেন শেষটা, এতও বরাতে ছিল? অমিতার ভবিষ্যতের জন্য, তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ

সংগ্রহেতে আমাদিকে শুদ্ধ এই কুৎসিত ব্যাপারটাতে যোগ দিতে হইল?

সিদ্ধেশ্বর জায়া বলিল, "কি করবে—সৎ বুদ্ধিমান পাত্র দেখে দিলে এতটুকু পোহাতে হ'তোনা।"

বাহিরে তখন নরোত্তমের সহিত ডাক্তার, স্থানীয় লোকের কাছ হইতে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতেছিল, সত্যই অমিতার স্বামী বৃন্দাবনচন্দ্রের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কি না? প্রায় যাহারা ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, সকলে একবাক্যে বৃন্দাবন চন্দ্রের বিকৃত মস্তিষ্ক সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইতেছিল। অমিতার মা-ও ডাক্তারকে কাঁদিয়া বলিলেন, "কি বলবো ডাক্তার বাবু, মেয়ে একবার তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে, তাতেও জামাইএর আমার ঘোর আপত্তি।"

সিদ্ধেশ্বর জায়াও অনেকখানি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি সিদ্ধেশ্বরকে বলিলেন, "আর শুনেছ—ঐ নতুন বাড়ীখানা—যেখানা তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরী ক'রে দিলে, ঐ বাড়ীখানা হবে কি না টোলের পণ্ডিতের—ব্যাপারখানা বোঝো—যে মানুষ···তুমি ঘরের বাহির হ'তে পারতে না, স্রেপ, বোনের ভাল খুঁজতে এতখানি দায়িত্ব ঘাড়িয়ে নিয়েছিলে—সে বাড়ীতে বোনকে তোমার ঢুকতে হবে না?"

বাতে পঙ্গু শয্যাশায়ী সিদ্ধেশ্বর, প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ বালিশটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"বল কি?"

সিদ্ধেশ্বর জায়া বলিল, "আর বল কি? ঠাকুরঝি যেই লেখা-পড়া জানা মেয়ে—বুঝদার, সেই এখনো চুপচাপ ক'রে আছে। আমরা হ'লে কি করতুম, তা ভেবেই উঠ্‌তে পারিনে। আর এ খবরটা শুনেছ?···ঐ টোলেরই একটা ছোঁড়াকে ধরে মেয়েকে আধা দান পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। আমি যে মেয়ে মানুষ, আমারও ইচ্ছে করচে, ডাক্তারের সামনে গিয়ে

বেশ ক'রে দুকথা বুঝিয়ে বলি,···এটা কি বৃটিশ রাজুত্বি না আর কিছু? স্বামী স্ত্রীকে পথের ভিখেরী করবো বল্লেই করতে পারবে? তার কোন কৈফিয়ৎ চলতে পারবে না?

সিদ্ধেশ্বর খুব গভীর করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন ব্যাপারটা এখন জীবন মরণের সমস্যার মতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যদি অমিতা প্রমাণ প্রয়োগ দেখাইয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রমাণ করিতে না পারে—তবে অনিবার্য্য তার দুর্গতি। কিন্তু তাহাকে বাঁচিতেই হইবে এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে, তাতে কম্ম গতিকে ধর্ম্মের পথে নামিতে হয়, কিম্বা অধর্ম্মের পথই অবলম্বন করিতে হয়। বাঁচা চাই-ই—বাঁচাই মানুষের ধর্ম্ম!—সিদ্ধেশ্বর তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, একবার নরোত্তমকে ডেকে দাও দেখি, নরোত্তমই দেখছি, আসল বন্ধুর কাজ করচে।

লীলা তাহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া দিল।

নরোত্তম আসিয়া বলিল, আমায় ডাকছিলেন?

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, হাঁ—ডাক্তারের ফি-র জন্য তোমরা ঘাবড়ো যেয়ো না, আমি শুদ্ধ প'ড়ে···কি করবে, ভায়া, একটু যত্ন নাও। মনে রাখা চাই, তোমার কার্য্য তৎপরতার উপরেই অমিতার জীবন-মরণ নির্ভর করচে।

নরোত্তম তাহার দিদিকে দেখাইয়া বলিল, আমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কাজের হাজার ক্ষতি করেও, এ বিষয়ের তদ্বির করতে হচ্চে।

—"এই ত তোমাদের মত ইয়ংম্যানদের যোগ্য কথা! ভাল কাজ করো—ঈশ্বর তোমার ভাল কাজের পুরস্কার দেবেন, ওঃ—একবার যদি পেতাম এই সময় বৃন্দাবনকে—

একটা খুব দীর্ঘরকম দীর্ঘশ্বাস, তাঁহার ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহিয়া গেল।

নরোত্তম নিতান্ত বিষাদ-মিশ্রিত স্বরে বলিল, আপনার যদি ভগ্নীর অবস্থাটা চক্ষে দেখেন, পাষাণ গলে যাবে···তা মানুষ কোন্ ছাড়্! শুনলুম উঠ্‌তে বসতে লাথিও আরম্ভ হ'য়েছে, আপনার কাছে বৃন্দাবন বাবুর আসবার কথা কি বলছেন, যত আক্রোশ ত আপনাদেরই উপরে—

সিদ্ধেশ্বর অতি কষ্টে বালিশে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, —বড়বৌ আমায় একবার তুলে বসিয়ে দিতে পারো···আমি একবার জানোয়ারটাকে দেখি।···তুমি বল কি নরোত্তম—পিশাচটা অমিতার গায়ে হাত তুলেছে ?

সিদ্ধেশ্বরের চোখ দিয়া যেন আগুণ ঠিকরাইয়া বাহির হইতে লাগিল।

লীলা সিদ্ধেশ্বরকে শোয়াইয়া দিয়া, এবং হাঁটুর ব্যাণ্ডেজটাকে আবার যথাস্থানে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, তুমি যখন উঠতে পারবে না—তখন বৃথা চেষ্টা ক'রে কি ফল বলো ? নরোত্তম ত ওর সাধ্যিতে যা কুলোয়—তা করচে।

নরোত্তম যথেষ্ট সহানুভূতি মিশ্রিত স্বরে বলিল, আমি আপনার ভগ্নী আর আমার ভগ্নী, একদণ্ড তফাৎ মনে করে থাকি মনে করেন ? সিদ্ধেশ্বর বাবু, লোকে কতই বলাবলি কচ্চে, শুনতেও পাচ্চি, কিন্তু আপনি যদি ভাল থাকতেন আমার মোটেই কিছু না দেখলেও চলতো। সব স'হে এক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে চলতে হয়েছে। অমিতাকে বাঁচাতেই হবে যে।···

কথাগুলা এত মধুর, এত—মিষ্টি এবং এমন মোলায়েম ভাবে নরোত্তমের মুখ হইতে বাহির হইল, সিদ্ধেশ্বর একবারে গলিয়া গেলেন। অশ্রু অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, নরোত্তম ভাই—ঐ লক্ষ্যই স্থির রাখো যে অমিতাকে বাঁচাতে হবে। আহা বেচারী অমিতা···দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

নরোত্তমও আস্তে আস্তে এ ঘর ছাড়িয়া বাহিরের ঘরে, যেখানে ডাক্তার আর পাঁচজনের সহিত এই সম্বন্ধেরই কথাবার্ত্তা কহিতেছিল সেইখানে উপস্থিত হইল।

অমিতার মায়ের একান্ত হিতৈষী পাড়ার ঠাকুর্দ্দা—ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা ডাক্তার মশাই, আমাদের কাছ হ'তে সাক্ষী-সাবুদ না হয় সব ঠিক-ঠাক পেলেন—এর পর কি করবেন? ধরুন, ও পক্ষের লোকও দু একজন বৃন্দাবন বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে সাক্ষ্য দিলে—তারপর?...

ডাক্তর হাসিয়া বলিলেন, তারপরই ত কাজ আমাদের সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এলো। সেক্রেটরী অপিসে রিপোর্ট পাঠিয়ে খবর দেবো, গবর্ণমেণ্ট থেকেই রোগীর ব্যবস্থা-পত্র চলে আসবে, ব্যবস্থা আর কি, তেমন দুরন্ত অবস্থা দেখলে—হয় বন্ধ অবস্থায় রোগীকে বন্ধ রাখার হুকুম হবে, নয় সম্পত্তি ঘটিত ব্যাপারে রোগীর কোন হাত থাকবে না। মোট কথা শেষটা খুব ভালই।—

নরোত্তমও ডাক্তারের কথাটায় যোগ দিয়া বলিল, বিলেতে এ রকম ঘটনা ত প্রায়ই ঘট্‌ছে, আমার সামনেই দুটো তিনটে ঘট্‌তে দেখেছি, ওদেশে তাই ডাক্তারের খাতিরও খুব, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, বিলেতে যাদের বিয়ে হবে, কিবা স্ত্রী—কিবা পুরুষ, ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে তবে চার্চ্চে দাঁড়াতে পাবে, নইলে পাদ্রী বিয়ে মঞ্জুরই করবে না।"

ঠাকুর্দ্দা সেকেলে মানুষ, একথায় একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই রকম সব ব্যাপারেই যদি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সমাজকে চলতে হয়, তবেই ত গেছি।"

নরোত্তম সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়া বলিল, "না ঠাকুর্দ্দামশাই, এ খুব ভাল নিয়ম, সমাজে সুস্থ-সবল মনোবল সম্পন্ন লোকের আবির্ভাব তাতে বেশী ঘটচে, ওরা প্রত্যেক সামান্য বিষয়েও রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকায়,

আর আমাদের দেশে—যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ, সে-ও অবলীলাক্রমে, এক বালিকার হাত ধরে ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্চে। কারণ বিবাহ তাকে করতেই হবে, বামুনের শাস্ত্র তাকে হুকুম দিয়েছে বিয়ে ক'রে পুত্রোৎপাদন না করলে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে। দেশটা সাধে অধঃপাতে যায়নি ঠাকুর্দ্দা মশাই—অনেক কাল হ'তে স্তুপাকার গলদ এর পেছনে জমায়েৎ হয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা শাস্ত্র সম্বন্ধে কি একটা তর্ক তুলিতে যাইতেছিল, নরোত্তম তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিল, "আপনি সম্ভব এই কথা বলবেন, শাস্ত্রগ্রন্থে কই এ রকম ত দেখা যায় না। কিন্তু দেখুন ঠাকুর্দ্দা মশাই, শাস্ত্রের বাইরেও একটা লৌকিক শাস্ত্র আছে, প্রতিদিনকার কাজে কর্ম্মে আচারে ব্যবহারে, ঐ শাস্ত্রেরই পরামর্শ মানুষকে বেশী করে নিতে হয়, তাই বলছিলুম ঐ শাস্ত্র যারা চালায়—ঐ শাস্ত্রের যারা কর্ণধার—তাদের তুলনা নেই—আপনারা চান যে পেষণটা আমাদের পথের ধূলির মত গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশ্বজগতের দ্বারে নিতান্ত তুচ্ছ করে রেখেছে, সেই পেষণ-যন্ত্রটা আবার আমরা ভাল ক'রে তার কলকব্জাগুলোতে তেল লাগাই? এর চাইতে আহাম্মুখী কাণ্ড জগতে আর দুটি আছে?"

কেন যে এই লেকচারটা নরত্তমের সহসা দিবার এত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোন প্রকার কৈফিয়ৎ তাহার নিজের কাছে ছিল না, কিন্তু তবু তাহাকে সন্দেহ নিরাসনের জন্য এ লেকচারটা তাহাকে মুখে মুখেই বানাইয়া যাইতে হইল। সকল শ্রোতাই নরোত্তমের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিল, এমন কি যিনি কখয়না কিছু বোঝেন না। সেই অমিতার মা পর্য্যন্ত নরোত্তমের কথায় অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। এবং পরশী আনন্দের মাকে চেতনা দিয়া বলিলেন, এই সব ছেলেরাই দেশে নতুন জগত আনিবে কি না—তোমরাই তার বিচার করো!

ঠাকুরদাও সার্টিফিকেট দিয়া বলিলেন, এই সব ইয়ং বেঙ্গলের দল,

এরা আচার বিচেরের ধার ধারে না বটে, কিন্তু আসলে ভারি খাঁটি, এরা ভণ্ডামির যেমন যম, সত্যের তেমনি পরম ভক্ত!

কথাটা নরোত্তমের কাণে গিয়াছিল কি না—সে খবরের পূর্ণ বিবরণ দিতে পারি না, তবে যখন সে ডাক্তারের সহিত তার বাসায় গেল, তখন তার মুখে চ'খে—একটা বিজয় গৌরবের দীপ্ত আভাষই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ডাক্তারও কি ভাবিয়া ছোট্ট করিয়া বলিলেন,—তোমার "বিজয়িনী" যে জয়ী হবেন তা নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বানী করছি"—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন হোমের ক্ষেত্রে গৃহস্বামিনী আসেন নাই শুনিয়া, পণ্ডিত রামচন্দ্র, বৃন্দাবন চন্দ্রকে আর একটী পঞ্চরাত্র যাগের পরামর্শ দিলেন, এ পঞ্চরাত্রের ফল কখনো ব্যর্থ হইবে না। স্বয়ং গৌতম ঋষি এই যাগ করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে অনুতপ্তা-রূপে অহল্যাকে পাইয়াছিলেন।

শাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্ত আনাড়ী, বৃন্দাবনচন্দ্রের কথাটা কেমন বিশ্বাস হইল, আবার পঞ্চরাত্র যাগের আয়োজন করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া দিল। তবু বৃন্দাবন আর একবার সন্দেহ ভঞ্জনের ছলে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার স্ত্রী যে এই সমস্ত ব্রাহ্মণের ক্রিয়া-কলাপকে একেবারে কু সংস্কার ব'লে উড়িয়ে দেয়—তাই কেমন আমার বেশ ভরসা হচ্ছে না।

রামচন্দ্র বলিলেন, তাঁকে কেউ কোন দিন বোঝাননি, কুসংস্কারকে

আমরা পাই বিকৃত বুদ্ধির মাঝখান হতেই···আচ্ছা। তিনি আসুন, শুনেছি, তিনি জ্ঞানমতী, একদিন আমি তাঁকে বসিয়ে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শোনাতে পারলে—সম্ভব মতি পরিবর্ত্তন করতেই হবে।

বৃন্দাবন বলিল, ওরা তর্ক ক'রে কি বলে জানেন, বলে হিন্দু-ধর্ম্মের আবার আছে কি? কতকগুলো প্রাণহীন আচার, আর ছুঁৎ-মার্গ নিয়ে তার কারবার।···যদিও আমি জানি, এ ছুঁৎ-মার্গের আর আচারের কেন প্রয়োজন ছিল—কিন্তু ওরা ওদের বুদ্ধিকে তর্কের দ্বারা এমন ঘোলাটে ক'রে ফেলেছে—খাঁটি কথাও তারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেয়।

রামচন্দ্র বলিলেন, হিন্দুধর্ম্ম যে কত বড় উঁচু ধর্ম্ম, এর বেদান্ত যে কত বড় সমন্বয়···তা যারা এর দুয়ারের কাছে দাঁড়ায়নি তারা কি ক'রে বুঝবে? এ ধর্ম্ম বহুকে নিয়েই অনাদিকাল ধরে চলে এসেছে, কাউকে ঘৃণা করেনি, অবুঝ লোকে যাই রটাক, তার ধর্ম্মে সব চাইতে বড় কথা—"সর্ব্বত্র একত্ব-মনুপশ্যত।" হিন্দুধর্ম্ম আর যাই হোক, কেড়ে নেওয়ার ধর্ম্ম নয়—মানুষকে বাঁচাবার ধর্ম্ম,—রাষ্ট্রের দিক হতেও যদি বিচার করতে বসেন, তবে জগত যদি কোন দিন বাঁচে—তবে হিন্দুধর্ম্মের পন্থাই তাকে অবলম্বন করতে হবে।

বৃন্দাবন রামচন্দ্রের কাছ হইতে কতবার এই কথা শুনিয়াছিল, আবার তাহার এই কথা মধুর লাগিল। সে এই কথাই বুকের ভিতর ধারণা করিয়া রাখিতে চাহে। তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় উন্মুক্ত করিয়া রাম চন্দ্রের কথা শুনিতে লাগিল।

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনার স্ত্রী আসুন, তারপর তাঁকে আমি বেশ করে বুঝিয়ে বলবো। কেবল তাঁকে এই কথাটি জপ করতে বলবো।

বেদাহ মেতং-পুরুষং মহান্তং
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

প্রায় মিনিট পাঁচের পর, হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠার মত বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল—সব ব্যর্থ হবে বলেই অনুমান করি, বেদান্তরত্ন মশাই, পশ্চিমের শিক্ষা তাদের ধারণা শক্তিটুকুকে পর্য্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছে।

রামচন্দ্র বলিলেন, তা দিক। হোমাগ্নিতে যখন তাঁর পাপ আহুতি দেবো—তখন তাঁকে ফিরে আসতেই হবে।

বৃন্দাবন বলিল—আমার বোধ হয় তারা পাপকেই স্বীকার করে না, তা পাপের আহুতি স্বীকার করবে।

রামচন্দ্র বলিলেন—যা, হোক, একটা কিছু স্বীকার করতে হবে ত?

বৃন্দাবন। কিছু না, স্বীকার করে তারা এক অর্থ, আর দৈহিক সুখ সম্ভোগ। অর্থ আর সম্ভোগের খাতিরে তারা না পারে জগতে এমন কাজ নাই। সমস্ত দেশটাই ঐ সম্ভোগ আর অর্থের পেছনে এক লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আপনি এমন হোমের আগুণ জ্বালান, যাতে—সমস্ত দেশের পাপ নিঃশেষে, পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়।

কথা হইতেছে এমন সময় কে একজন আসিয়া বৃন্দাবনকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেল। খানিকপরে মুখটা গম্ভীর করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—শুনেছেন, আমাদের এই হোম যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে আমার শ্বশুর বাড়ীতে একটা দল পেকে উঠেছে, তারা আমাদের ছিত খুঁজতে এই সব হোম যাগের পেছনে পুলীশও লেলিয়ে দেবে শুনলুম!

রামচন্দ্র অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা কি হিন্দু নন?

বৃন্দাবন বলিল, তাঁরা কিছুই নন, এক কালে ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন—এই মাত্র পরিচয়।

রামচন্দ্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, ধর্ম্মহীন মনুষ্য সমাজে, জগতে যে বড় ভয়ানক পদার্থ।—

আজকে দ্বিপ্রহর হইতেই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল। বৃন্দাবন তাহার স্ত্রীর হইয়া নিজেই উপবাস করিয়া ফেলিল। আদালত যাওয়া প্রায় মাসাবধি ত্যাগ হইয়াই ছিল, সেই জন্য এই উপবাস হেতু কাজকর্ম্মের ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে না।

সারারাত্রি হোমের আগুন জ্বলিবে এবং সারারাত্রি ধরিয়া বিশ্বপাপ তাহাতে আহুতি দেওয়া চলিবে। নতুন বাড়ীতে হোম হইতেছিল, শ্যামবাজারের বাড়ী বসিয়া অমিতা সব খবরই লইতেছিল। আজও পঞ্চশিখ পুরোহিতের পদে বসিয়াছে এবং বৃদ্ধ রামচন্দ্র আচার্য্যপদে ক্রিয়া কলাপের পথপ্রদর্শক হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

আজও কন্যা রেখার ডাক পড়িয়াছিল, অমিতা তাহাকে যাইতে দিল না। গাড়ী করিয়া তাহাকে তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, তখন একজন পুলীশের, সার্জ্জন আসিয়া বৃন্দাবনকে ডাক দিল। বৃন্দাবন পূজা কার্য্য ছাড়িয়া যাইব না বলিয়া খবর পাঠাইল, :কিন্তু সার্জ্জনটা তাহা শুনিতে চাহিল না, পট্টবস্ত্র পরিহিত অবস্থাতেই সার্জ্জনটার সহিত তাহাকে দেখা করিতে যাইতে হইল। ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা হইল। সার্জ্জনটা তাহাকে তাহার পেছন আসিতে বলিল।

কোথায় যে যাইতে হইবে তাহার কিছু ঠিকানা বলিল না—অথচ যাইতেই হইবে, বল প্রয়োগের কোন উপায় ছিল না—কিন্তু বৃন্দাবনের ভারী রাগ হইল, ভাবিল, কালই অমৃতবাজারে এ সম্বন্ধে একটা বড় রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়া দিবে। কাছে যে একজন ভৃত্য দাঁড়াইছিল

তাহাকে বলিয়া দিল, যতক্ষণ আমি ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ পর্য্যন্ত হোম যেন দিবারাত্র ধরিয়া চলে। টাকাকাড়ি পিসিমার কাছেই আছে।"

বৃন্দাবন খালি পায়েই পুলীসের মোটরে উঠিল। মোটর বৃন্দাবন ও সার্জ্জনকে লইয়া বোঁ বোঁ—আপনাদের গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া গেল।

এখানে বেদান্তরত্ন ও বিস্তারত্নে মিলিয়া প্রাণপূর্ণ আবেগে…"স্বাহা" মন্ত্রে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। রাস্তাদিয়া যাহারা যাইতেছিল তাহাদেরও ক্ষণেকের জন্য কাজ ভুলিয়া বাড়ীর মধ্যেকার ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। সন্ধ্যার দিকে অমিতা, লাল সাড়িটার উপরে কাশ্মিরী আলোয়ানটা জড়াইয়া এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পেছনে নরোত্তমও ছিল, কিন্তু সে পূজার স্থান অবধি গেল না। বাহিরের বড় হলটায় যেখানে এই বাড়ীর চাকর ও ঝীর দল উৎসুক ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে একখানা চেয়ারের উপরে একটা সিগার ধরাইয়া বসিয়া পড়িল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, যেন কি একটা বিশ্রী ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গেছে—তাই সবাই স্তব্ধ হইয়া আছে। সরকার নফর সেই শুধু, বাবু যে পুলীশের সার্জ্জনের সহিত গিয়াছেন এই সংবাদটা দিল। নরোত্তম তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে কাণ খাড়া করিয়া সিগারটা টানিয়া যাইতে লাগিল।—

নফর কি করিবে না করিবে এই রকম একটা দ্বিধায় পড়িয়া নরোত্তমের পরামর্শ লইতে চাহিল। নরোত্তম এবারও চুপ চাপ সিগারই টানিয়া যাইতে লাগিল, সহসা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চলো ভিতরের দিকেই যাওয়া যাক।"

যখন সে ভিতরের দিকে গেল, দেখিল, যজ্ঞকুণ্ডের একধারে অমিতা

স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র যেন এই সিংহিনীটিকেও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, নরোত্তম ডাকিল, "অমিতা!"—

অমিতা পেছন ফিরিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা করো। আহুতিটা শেষ হ'য়ে যাক।"

"ওঁ তৎ সর্ব্বং সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"

অমিতা দাঁড়াইয়া কেবল আহুতির মন্ত্রটাই শুনিতে লাগিল—প্রায় মিনিট দুয়েকের পর নরোত্তম অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল,—"অমিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্র শোন্‌বার জন্যেই তোমার এখানে আসা হয়নি, মনে আছে, কি—গুরু দায়িত্বভার নিয়ে তোমায় বেড়িয়ে পড়তে হয়েছে? একটা জীবন মরণের সমস্যার সম্মুখে তুমি, তোমায় বাঁচতে হবে...

অমিতা তাহা জানিত, নরোত্তমের সে কথা স্মরণ না করাইয়া দিলেও চলিত, সরকার নফরকে আদেশ করিল, "সরকার মশাই এঁদের যাঁর যা কিছু পাওনা চুকিয়ে দিয়ে—হোম বন্ধ করতে আদেশ দিয়ে ফেলুন। আজ হ'তে সংসারের আলাহিদা ব্যবস্থা হ'ল।" কথাটা বলিয়াই নরোত্তম আর অমিতা উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছিল। মন্ত্র উচ্চারণ বন্ধ করিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্লে মা—আজ হতে সংসারের আলাহিদা ব্যবস্থা হ'ল?" তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ইনিই বৃন্দাবন বাবুর স্ত্রী।

অমিতাকে আর উত্তর দিতে হইল না। নরোত্তমই জবাব দিল, কিন্তু জবাবটা তাহার অত্যন্ত রুক্ষ শোনাইল। যেন ব্রাহ্মণের এই ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে জন্মগত একটা রোষ কোথায় লুক্কায়িত হইয়া আছে, বলিল,—"ব্যবস্থা আলাহিদা হোক, আর নাই হোক, আপনার কাছে উনি কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না। আপনারা পয়সা নিয়ে হোম, যাগ করতে

এসেছিলেন, পয়সা নিয়ে যান, আপনাদের বেশী জিজ্ঞাসা-বাদের প্রয়োজনই বা কি ?”...

বড় দুঃখে রামচন্দ্রের বুক ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল, বলিলেন, “একটু আগে বাবু পুলীসের লোকের সঙ্গে চলে গেলেন, আমরা তাঁর কোন খবরই পেলাম না, ওম্নি যাও—বল্লেই যাওয়া হবে? যদি একটা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, একটা নীতির ব্যভিচার দেখি—আমরা ব্রাহ্মণ সমাজ শাসক—চুপক'রে তাই দেখে চলে যাবো ?”...

নরোত্তম তাচ্ছিল্যের সহিত হো হো হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “তাছাড়া আর উপায়ই কি ? পয়সা উপায় করতে এসেছেন, পয়সা উপায় ক'রে বাড়ী নিয়ে যান, আপনাদের বুজরুকী বেশ জানা আছে, বেশী ঘাঁটা ঘাঁটি করবে না বলে রাখছি, এখন হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত সার মর্ম্ম ঐ পয়সার মধ্যে দাঁড়িয়েছে, জানতে বাকী নেই। কই সরকার মশাই, উপরে চেয়ার টেবিলের বন্দোবস্ত আছে ত ?”

সরকার তাড়াতাড়ি চেয়ার টেবিলের বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল—সে বেশ জানিতেছিল ভবিষ্যতে ইহারাই তাহার মুনিব হইবে। অমিতা মুখে রুমাল দিয়া এই অক্ষম ব্রাহ্মণের শোচনীয় আর্ত্তনাদ দেখিতে লাগিল। নরোত্তমেরও পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে এই অভিনয়টা মন্দ লাগিল না।

রামচন্দ্র গায়ের চাদরখানা কয়েকবারই বৃথা গায়ে জড়াইতে চেষ্টা করিয়া পুঁথি হস্তে উঠিয়া পড়িলেন, ভাঁটাড়মত একযোড়া গোল চশমার ভিতরে চক্ষু দুটা যেন বাঘের চক্ষুর মত জ্বলিয়া উঠিল। রামচন্দ্র তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—আপনারাও সম্ভব ব্রাহ্মণ হবেন, কিন্তু বামুন হ'য়ে বামুনকে এত বড় অপবাদটা দিতে বোধ হয় আর কারও সাহসে কুলাতো না। যে ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তের মত এত বড় সাম্রাজ্য চালিয়ে

এসেছিল সে লোভীই ছিল বটে, যে ব্রাহ্মণ আজকের দিনেও বিদ্যাসাগরের মত মানুষ গড়ে ছিল সে লোভীই বটে,—তোমরা ভোগের মধ্যে—আর অর্থ পিপাশার মধ্যে আকণ্ঠ আপনাদের ডুবিয়ে রেখেছ, তোমরা কি করে বুঝবে যে ব্রাহ্মণ কি পদার্থ? যে সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস সর্ব্বগন্ধ-জয়ী···সে লোভ করবে তুচ্ছ পয়সাকে?···তার এক লোভ আছে "শিবতত্ত্বে—" সত্যি বলছি, সে শিষ্য অনুশিষ্যের শিবত্বই খোঁজে—তাই বলে সে পয়সা পিশাচ নয়—জেনে রেখো।...ত্রৈলোক্য রাজ্যমপিদেব তৃণায় মন্যে—সে ব্রাহ্মণেরই কথা।"

অমিতাকে শোনাইবার জন্যই রামচন্দ্রের এতখানি বলিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া কথা শুনিবার মত সে অবস্থা তাহাদের তখন নয়। তাহারা তখন নতুন বাড়ীর বুঝ লইতে আসিয়াছিল, অদ্ভুত অবজ্ঞা-ভরা হাসি হাসিয়া নরোত্তম আর অমিতা উপরের ঘরের দিকে উঠিয়া গেল। রামচন্দ্রও তাহাদের পেছন পেছন উপরে যাইবে মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নরোত্তমের একটা ভৃত্য তাহাকে উপরে উঠিতে যাইতে বাধা দিল।

রামচন্দ্র প্রতিহত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারও এতক্ষণে বৃন্দাবন বর্ণিত ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ হইল। তিনি এই ভীষণ বিভীষিকাটা অনুমান করিয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিলেন, ওদিকে পঞ্চশিখও মূর্চ্ছাহতের মত বসিয়া ছিল। সেও জানিতে পারিয়াছিল ঐ জুতা পায়ে মেম সাহেব তাহার ভাবী শাশুড়ী, এমন ধারা তাঁহার ব্যবহার, এই যজ্ঞবেদীর সম্মুখে জুতাটা খুলিবারও আবশ্যক বোধ হইল না। সমস্ত ভিতর বাহির তাহার যেন জ্বালা করিতে লাগিল, এই স্তিমিত প্রায় ধুমায়মান বহ্নি-কুণ্ডের সম্মুখে তাহার দাঁড়াইয়া বলিতে ইচ্ছা করিল—হে অনাচার, তোমার ধ্বংশ হোক···হে ব্যভিচার তোমার—ধ্বংশ হোক!

রামচন্দ্রও মাথায় হাত দিয়া একধারে বসিয়া পড়িলেন, তামাক সাজিবার জন্য একটা চাকরকেও পাইলেন না। যেন যাদুমন্ত্রে সব যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল। ক্ষোভ-ক্ষিন্ন-স্বরে পঞ্চশিখকে বলিলেন, "পঞ্চশিখ যজ্ঞ যে ভস্ম হয়ে গেছে তা বুঝতে পাচ্চি, কিন্তু কথা দাঁড়াচ্চে বৃন্দাবন চন্দ্রের মেয়েটাকে নিয়ে।..."

পঞ্চশিখ মুখ ফিরাইয়া ঘৃণায় চঞ্চল হইয়া বলিল,—"দাদামশাই, আপনি এই ম্লেচ্ছের গর্ভের কন্যা নিয়ে সংসারে সুখ-শান্তির আশা কল্পনাও করতে পারেন?"

রামচন্দ্র বলিলেন—"কিন্তু যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখে একদিন যে বৃন্দাবন চন্দ্র।..."

পঞ্চশিখ বলিল—"আপনার বৃন্দাবনচন্দ্রকে না সরিয়ে কি এতখানি করবার সাহসে কুলিয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁকে যে পুলীশ সার্জ্জন নিয়ে গেল, সে সত্যি করেই নিয়ে গেল।

রামচন্দ্র বলিলেন—"ফিরে আর আসতে দেবে না?—বল কি?"

পঞ্চশিখ বলিল—"ওঁদের চোখ মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন না? ওঁরা কি রকম উন্মত্ত হ'য়েই এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন?"

রামচন্দ্র গভীর ক্ষোভ ক্ষিন্ন স্বরে বলিলেন, "তাহ'লে সত্যিই সংসারের নিয়ম উল্টে গেল।—কথা মিথ্যা নয়···মায়ের যদি তাই ইচ্ছা হয়, হোক! কিন্তু এই কি গৃহের কল্যাণী মূর্ত্তি? পঞ্চশিখ দেখলে মাতৃ-ভাব নেই, ছিন্নমস্তার ভাব···নিজের রুধির ধারা নিজে—আর ডাকিনী যোগিনীদের খাওয়াবে ব'লে বেরিয়ে পড়েছে।"

এই সময় সরকার নফর, ব্যস্ত হইয়া এই ধার দিয়া কোথায় যাইতে

ছিল। রামচন্দ্র তাহাকে ডাকিলেন, নফর বলিল—আসছি দাঁড়ান। বলিয়া চলিয়া গেল, তারপর কয়েক দণ্ডের মধ্যে গৃহকর্ত্রীর কাজ সারিয়া পুনরায় রামচন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র বলিলেন, উনি কে নফর? ঐ সাহেব বেশী যুবকটি?

নফর চারিদিকে এদিক ওদিক বেশ করিয়া চাহিয়া অতি সন্তর্পণে অতি ভয়ে ভয়ে বলিল,—"বলব আর কি গুরুদেব, যত নষ্টের গোড়াতেই ঐ উনি, মা-ঠাকরুন ওঁকে যে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন, উনি যা বলছেন তাই শুনছেন, শেষকালটায় কি যে কি হবে কিছু ভেবে পাচ্ছিনে—বাবুও তাই বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু কি যে সব—কি করে বসলো, যেন ভেল্কী ব'লে মনে হচ্ছে···আমি, বাবুর খবর নিতে থানায় যাবো কিনা জানতে চাইলুম, বল্লে—"প্রয়োজন নেই; তার চাইতে একবোতল বিয়ার আনিয়ে দিয়ে যাও! মা-ঠাকরুণের উনি পরম বন্ধু।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"সম্পর্কে কিছু হয় কি?"

নফর বলিল, "সম্পর্ক আর কি—শুনেছি, মা ঠাকরুণের দাদাবাবুর উনি শালা।"

রামচন্দ্র পঞ্চশিখকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, "ভারি একটা আশা নিয়ে আসা গিয়েছিল—যে একজন গুণী লোকের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে, মনের কথা দুটো বলবো—যাক মহামায়ার মহালীলাই জয়যুক্ত হোক্! হিন্দু কত শতাব্দীর—কতবার কত জাতির—উত্থান পতন দেখেছে,—আবার এখনও তার দাঁড়িয়ে দেখবার পালা।···সব ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়বে—আবার ভাঙ্গার মধ্যেই নতুন প্রাণের সাড়া মিলবে,—তোমরা ভয় পেয়োনা, পঞ্চশিখ, নির্ভয়ে তোমাদের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে চলো! আর ডাকো কে আছো যাত্রী এসো—এই মন্ত্র নিয়ে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্য পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায় ॥”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সারারাত্রি বৃন্দাবনের একরকম বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গেল। কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না, এ রকম ভাবে পুলীশের হেফাজতে থানার গারদে রাখিবার, তাহার কারণ কি? মাঝে মাঝে অজানা ভবিষ্যতের একটা বিকট বিভীষিকা প্রলয় রাত্রির বুকে বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিতেছিল।—বৃন্দাবন সে দিকে সজ্ঞানে চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারিতেছিল না—সম্ভব আর অসম্ভবের দোলায় তাহার চিত্তটা যেন নাগরদোলার মত পাক খাইতে লাগিয়া গিয়াছিল; একবার ভাবিতেছিল, সত্যই কি সে বন্দী হইল?—তৎক্ষণাৎ মনে আসিতেছিল হেতু কি?···আবার এ সম্ভাবনাটাও মনে আসিতেছিল, কার্য্যোদ্ধারের জন্য তার স্ত্রীও তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে।—

স্ত্রী যে তাহার এতখানি করিতে পারিবে এ কল্পনাটা করিতেও তাহার কষ্ট বোধ হইতেছিল; ভাবিয়া দেখিতে গেলে সে ত তাহার স্ত্রীর পরে একদিনও অসদ্ব্যবহার করে নাই, তাহার মর্য্যাদা পুরাপুরিই দিয়া আসিয়াছে; কোন খবর পাইতেছিল না—পঞ্চরাত্র যাগে, ব্রাহ্মণেরা

কি করিতেছে কি না করিতেছে—ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু দুটি লাল কুঁচের মত রাঙা করিয়া ফেলিল।

প্রহরী সকাল বেলায় দরজা খুলিয়া দিতে আসিবার সময় বলিল, —"বাবু তুমি কি পাগল হয়েছো?"

—"পাগল?"—হঠাৎ চন্ করিয়া বৃন্দাবনের মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল। প্রহরীকে বলিল,—"অসম্ভবও না হ'তে পারে বাবা, তবে এটা সত্যি—আগে পাগল ছিলুম না, এখন হ'য়ে গেছি,"—

প্রহরী আবার বলিল, "ডাক্তার সাহেব আসিছেন, চুপ করিয়া থাকিবেন—তিনি আসিলে যদি গোলমাল করেন, তবে হাতে হাত কড়ি লাগানো হইবে।"

একরাত্রির মধ্যে একেবারে মনুষ্য সমাজের বাইরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার মনের অবস্থাটা কি হইতে লাগিল, তাহা এক অন্তর্য্যামী ছাড়া কাহারও বুঝিবার উপায় থাকিল না; উপর হইতে ফাঁড়িদার হাঁকিয়া বলিল,—"ডাক্তার সাহেব আসচেন, হাতকড়া লাগিয়ে দাও।"

আর এক ফাঁড়িদার হাতকড়া লইয়া উপস্থিত হইল। প্রহরী হাতকড়িই লাগাইয়া দিল!

প্রহরীটা বলিল,—"কি করবে বাবু নিজের কর্ম্ম ফলে—বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ, এখন গারদে থাকো।...পচো।"

বৃন্দাবন বুঝিল তাহার এখন মুক্তির চেষ্টা—সত্যই বাতুলতা মাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কয়টা বেজেছে প্রহরী?"

প্রহরী বলিল,—"সাতটা।"

বৃন্দাবন কেমন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমায় একবার বাইরে আকাশের আলো দেখাতে পারো না? ওঃ—চিরকাল তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো, ভাই, একটু আলো! একটু আলো!

প্রতি মুহূর্ত্তে যেন তাহার কেমন যম যন্ত্রনা হইতে লাগিল। মনে হইল, সে চীৎকার করিয়া উঠে, ডাকিয়া বলে—সে উন্মাদ নয়···এ তাহার পরে অত্যাচার হইতেছে, কিন্তু কে-ই বা তাহার কথা শুনিবে? একবার হাতকড়িটা ভাঙ্গিবারও চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিয়া উঠিল না। উপরের দিকে হাত করিয়া বলিল,··· "ভগবান সত্যই তুমি আছো কি?"

"হাঁ আছেন"—বলিয়া ব্যঙ্গ হাস্যে একজন পুলীশ অফিসার সেখানে প্রবেশ করিল। সে বৃন্দাবনের দিকে রোষ কশায়িত নেত্রে চাহিয়া বলিল,—"খুব সাবধানে থাকবে, তোমায় বলে দিচ্ছি, যদি ডাক্তার সাহেব এলে—কোনরকম গোলমাল করো, তা হ'লে চাব্‌গে লাল করে ছেড়ে দেব! এই আমিই এইখানে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলুম, খুব হুঁসিয়ার, সেপাই তুমি 'ওর পেছনে দড়াটা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো।"

বৃন্দাবন বুঝিল ডাক্তার সাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে এই সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে। যে ধারণাটা কল্পনায় মাত্র করিয়াছিল, বাস্তবেও তাহা ফলিতে দেখিতে পাইল। বৃন্দাবন কথা বলিল না, চুপ করিয়া এই পৈশাচিক তাণ্ডবের সম্মুখে বলির পশুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কেমন তাহার কেবলি মনে হয় সে উন্মাদ ছিল না, এরা উন্মাদ বানাইয়া তবে ছাড়িল।

খানিক পরেই এক সঙ্গে কয়েকটা জুতার একতাল শব্দ শুনিতে পাইল। পুলিশ অফিসার মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করিল। বৃন্দাবন বুঝিল যে ডাক্তার সাহেব আসিয়াছে, তাহার পরীক্ষা চলিবে।

সাহেব ভিতরেও আর প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার সহকারী ডাক্তারদের ইংরাজীতে কি বলিলেন, তারপর খানিক স্থির ভাবে হতভাগ্য বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৃন্দাবনের কেমন অসহ্য কান্না পাইতে

লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে বুকের কলিজাটা ছিঁড়িয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে ফেলিয়া দেয়। আর বলে—দোহাই ডাক্তার আমি উন্মাদ নই, কিছুই নই—আমার স্ত্রী এই রকম ষড়যন্ত্র করিয়া গারদে পাঠাইয়া দিয়াছে। ডাক্তার স হেব—কথাটা পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল, পেছনে নরোত্তমকে দেখিয়া ক্ষোভে—লজ্জায়—ঘৃণায় কথাই কহিতে পারিল না। মাটির দিকে মুখ নামাইল।

ডাক্তার সাহেব নরোত্তম কিংবা আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,…"বুঝা গেছে পুরা উন্মাদের লক্ষণেই দাঁড়াইয়াছে, বহরমপুর কি রাঁচী এস্‌াইলামে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। যেথায় আপনাদের অভিরুচি।"

নরোত্তম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল,—আজ্ঞে রাঁচিই ভালো!"

গরাদের ভিতর হইতে বৃন্দাবন বলিল—"আরও বেশী দূরে এস্‌াইলাম নেই কি ডাক্তার সাহেব?…আরও অনেক দূরে—যেখানে বিলাত ফেরতদের কোন সম্পর্ক নেই…।"

নরোত্তম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, দেখাইয়া বলিল,—"দেখুন কি রকম ব্যাপারখানা—ফেরোশাস্ আর কাকে বলে? ঐ যে লাল চেলীখানা পরণে দেখছেন ডাক্তার সাহেব, ওঁয়ার সংকল্প ছিল—ওঁয়ার উপাস্য দেবতার কাছে স্ত্রী কন্যা দুজনকেই বলিদান দিয়ে মুক্তি দেবেন।…তার জন্য দু-জন ষণ্ডা রকম ব্রাহ্মণও এনে পাপ-নাশা যজ্ঞ আরম্ভ করে দেওয়া হ'য়েছিল।

বৃন্দাবন চীৎকার করিয়া বলিল,…নরোত্তম! সার্থক তোমার বাপ-মা…তোমার নাম নরোত্তম রেখেছিল…তোমার মত মিথ্যে বানাবার অদ্ভুত শক্তি…দুনিয়ার অল্প লোকেরই ছিল…চমৎকার!!

নরোত্তম আরো সঙ্গী ডাক্তার দুজনকে ডাকিয়া বলিল, "দেখছেন আপনারা? তান্ত্রিক বামাচারীর গারদের ভিতর থেকেও আস্ফালনটা দেখুন একবার।"

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন, নরোত্তম বড় ডাক্তারের সঙ্গী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব কত বৎসর এস্যাইলামে রাখবার কথা বলে গেল, কিছু বুঝতে পারলেন?

সঙ্গী ডাক্তার বলিল, কত বৎসর আবার কি, যত…বৎসর আপনারা খরচ জোগাতে পারবেন…চাই কি যাবজ্জীবনও রাখতে পারেন।

ইনচার্জ্জ অফিসার খাপবদ্ধ একখানা তরোয়াল হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন…বাবা এই তরবারির আঘাতে স্ত্রী কন্যাকে মোক্ষের পথে পাঠাবে ভেবেছিলে? আচ্ছা নরোত্তম বাবু, আপনি যে বল্লেন, উনি একজন বড় দরের উকীল ছিলেন। লেখা-পড়া শিখেও মানুষের মন, এরকম অদ্ভুত অতি-লৌকিক বিষয়ে আস্থাবান হ'তে পারে?

নরোত্তম এক গাল হাসিয়া বলিল, ঐ যে আপনাদের বল্লুম না… বিকৃত বুদ্ধি, এক ব্যাটা তান্ত্রিক বামাচারী, সেই কি গাছের শিকর খাইয়ে এতখানি উন্মাদ ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। আগে উনি একটু একটু মদ্য ইত্যাদি খেতেন কি না…

রাস্তার দিকে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। বৃন্দাবন কয়েদখানা হইতে কান্নার শব্দটা শুনিয়া অনুমান করিয়াছিল, কে কাঁদিতেছে… অভাগিনী পিসিমার ব্যথায় একবারে তাহাকে মুহ্যমানা করিয়া তুলিল। ভাবিল, বেচারী একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল, এইবার দুটো পেটের ভাতের জন্যও হয়ত কত তাঁহাকে লাঞ্ছনা সহিতে হইবে। অনেকক্ষণ ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতেও বেচারী একটু অনুমতি করিয়া লইতে পারিল না। বৃন্দাবন আর একবার নরোত্তমকে ডাকিয়া বলিল, "আচ্ছা নরোত্তম…"তোমার একটু চক্ষু লজ্জাও হ'লো না"…?

নরোত্তম তেরছা চোখে হাসিয়া বলিল · "শুনুন, একবার আপনারা—"

পুলিশের ইনচার্জ্জ অফিসার বৃন্দাবনকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, মজা

লোটো এইবার যাদু, তান্ত্রিক মতে সিদ্ধ হ'তে গিয়েছিলে—সব পাপ ভস্ম করতে হোম আরম্ভ ক'রেছিলে, এখন পাগলা গারদে ব'সে নিজে সেদ্ধ হও।…ওহে নরোত্তম বাবু চলো…চলো…বেড়ে ত কাজ বাগিয়ে গেলে, পাগলের বউটীও শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী!…

আরও সুন্দরী বউ লইয়া কত তাহাদের মধ্যে যে কুৎসিৎ রকম অঙ্গ-ভঙ্গীসহ হাস্য-পরিহাস চলিতে লাগিল…সকল কথা বৃন্দাবনের কানে গেল না, কিন্তু তবু তাহার মনে হইতে লাগিল এই সময় যদি বসুন্ধরা দ্বিধা বিভক্ত হইত—তাহা হইলে তাহাই তাহার যথেষ্ট সান্ত্বনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইত। তবু দু একটা কথা ইচ্ছা না করিলেও শুনিতে পাইল, খুব বড় রকম একটা ডিনার নরোত্তমকে দিতে হইবে, সে গ্রেট ইষ্টার্ণ কিম্বা গ্র্যাণ্ড হোটেলে বসিয়াই হউক।

অবশ্য কথাগুলা ইনচার্জ্জ অফিসারের পাশের ঘরেই বসিয়া হইতেছিল। বৃন্দাবন আপনার মনেই বলিতে লাগিল—"ভগবান আমায় পাগল করিয়াই দাও। পাগল হওয়াই এখন আমার পক্ষে বাঁচিবার একমাত্র উপায়।"

খানিক পরে আবার কাহার জুতার শব্দ শুনিতে পাইল, এ শব্দটা যেন বৃন্দাবনের অতি পরিচিত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল, এই পায়ের শব্দে তাহার মনে পড়িতে লাগিল অকারণে সে উন্মনা উঠিয়াছে, সহস্র কাজ ফেলিয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর তাহার পাশটিতে আসিয়া বসিয়াছে।

বৃন্দাবনের মনে হইল যেন তাহার পায়ের ভারে…এতবড় দ্বিতল গারদ খানাও হয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আকাশে কাক চীল-গুলা চীৎকার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহার স্থির ধারণা হইল, তাহারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, সমস্ত মঙ্গলের বিরুদ্ধে—জগত ব্যাপারের সমস্ত প্রেম ভালবাসার বিরুদ্ধে—

আকাশের কান্না, বসুন্ধরার কান্না—সে শুনিতে পাইল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিয়াছিল, এখন সে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কোথায় লুকায় ?...যে দিকেই যাইতে চায় নিরেট কঠিন দেওয়াল গুলা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কই বাড়ীখানা ত এখনও ভেঙ্গে পড়চে না!...এতখানি পাপ...বিশ্বমাতা বইতে পারছেন ?"...

প্রহরী একটা ধমক দিল, আবার যথাস্থানে চুপ চাপ আসিয়া বসিল। কিন্তু চোখ মেলিতেই দেখিল ..স্ত্রী অমিতা !—

অমিতা কষ্ট করিয়া জেলখানা পর্য্যন্ত স্বামীকে দেখিতে আসিয়াছে। এখনও তাহার দরদ আছে মনে করিতে হইবে। বৃন্দাবনের নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার চোখে জল দেখা দিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, চোখদিয়া আগুন ঠিকরিয়া পড়িয়া ঐ পাপিষ্ঠাকে ভস্ম করিয়া দেয়—কিন্তু তা হইল না, কোথা হইতে জলধারা আসিয়া এত বড় কলুষ প্রতিমার সম্মুখে অবনত হইয়া কৃপা ভিক্ষাই করিতে লাগিল। আজ যে মুক্তি দিবার ক্ষমতা তাহার হাতে আছে।

অমিতা গরাদে হইতে কিছুদূরে দাঁড়াইয়াছিল, সে দেখিতেছিল, এক রাত্রির মধ্যে মানুষের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে; সে মানুষ বলিয়া আর চিনিবার উপায় নাই। তাহার ভিতর কেমন কি একটা হইয়া গেল, কিন্তু সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, তাই দমিল না। আরও একটু কাছে সরিয়া গিয়া শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন কি বুঝছো ?"...

বৃন্দাবন খানিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর বদ্ধ হস্ত খুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "দূর হও পিশাচী,—এ কয়েদখানা পর্য্যন্ত অপবিত্র হ'য়ে যাবে।"—বলিয়া

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সপদ-দাপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েদ-খানার লোহার রেলিংগুলা পর্য্যন্ত সে পদশব্দে কাঁপিতে লাগিল।

অমিতা ছোট্টরকম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"কি করবে বলো—কর্ম্মফল !!"

বৃন্দাবন ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কর্ম্মফল বৈ কি—অতি ভীষণ কর্ম্মফল তাই পায়ের দাসীকে মাথায় তুলে রেখেছিলাম, তার যোগ্য প্রতিদান পাচ্ছি,—রাক্ষসী দূর হ'য়ে যাও বলছি !—এ কয়েদখানা পর্য্যন্ত নরোত্তমকে নিয়ে খোঁজ নিতে এসো না—তোমায় চ'খে দেখ্‌তে না পেলেই আমি শান্তিতে থাকব ! ওঃ—আমার ততবড় প্রেম—হতভাগিনী নারী দিনে দুপুরে কণ্ঠরোধ ক'রে তার অপঘাত মৃত্যু ঘটালো—

অমিতা বলিল, "চ'টে উঠ্‌ছো কেন ?—একটু না হয় সামান্য—যৎ-সামান্য রকম...তোমাদের পুরুষজাতির যুগ যুগান্ত ব্যাপী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছি, তার জন্য এতটা চ'টে ওঠা ত ঠিক নয় ! তুমি ত হিন্দু দর্শনে বিশ্বাস করো—ক্রিয়ার প্রতি ক্রিয়া আছে নিশ্চয় মানো, আজ যদি যুগান্তের সঞ্চিত পাপ—সঞ্চিত গ্লানি তোমাকে দিয়েই তার আহুতি পূর্ণ করে—তবে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমার সে আত্মদান করা উচিত—তা ছাড়া আমার নিজের দিক হতেও কিছু বলবার আছে, তুমি ত জানই, মেয়েকে আমি কি ভালই বাসতুম, এখনও বাসি, সেই মেয়েকে ধরে ফেলে দিতে চেয়েছিলে, গভীর পাঁকের অতল—গভীর তার মধ্যে...মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকাওনি, নিজের সংকল্প, আর প্রতিবাদ কারিণী স্ত্রীকে অপমানিত করবার দুর্দ্দমণীয় ইচ্ছাটাই তোমায় পেয়ে বসেছিল। কিন্তু দেখলে ত···স্ত্রীরও যদি শক্তি থাকে—প্রবল ইচ্ছা শক্তি থাকে—তা হ'লে সে দুর্ব্বল হ'লেও কেমন জয় কিনে নিতে পারে ?"···

বৃন্দাবন ক্রুদ্ধ হায়নার মত বিজয়িনী স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল।"

অমিতা আবার বলিতে লাগিল,—"ভেবোনা তোমার এই দুর্গতিটার দিকে তাকিয়ে ··সুযোগ পেয়ে, তোমায় দুকথা বলতে এসেছি, ততটা নীচ মনে করো না···তোমার কাছ হ'তে যা পাওয়া উচিত ছিল—তা পেয়েছি, মেয়ের জন্ম তুমি দিয়েছ···অজস্র উপায় করেও সে পয়সা বাজে ফুঁকিয়ে দাওনি···বরাবরই স্ত্রীর কথার বাধ্য হ'য়ে চলেছিলে, তার জন্য কৃতজ্ঞ আছি।···কিন্তু কিছুদিন হ'তে এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধতে লাগল,···সেটা হচ্চে আইডিয়া নিয়ে মতভেদ, তুমি old hinduismকে like করলে, তাতেও আমার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না—আইডিয়া আইডিয়া মাত্র যখন,...কিন্তু ঐ আইডিয়া যখন কাজে লাগাতে চাইলে—তখনই আমায় বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হ'লো, আর সেই দিন হ'তে তোমায় দেখলুম যেন বুকের উপরে একখানা পাষাণ ভার,···একেই তোমাকে কোন দিন আমি সত্যিকার ভালবাসা বাসতে পারিনি...তার কারণ দু'জনকার মধ্যে বয়সের একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান ছিল, তুমি যে ভাব্‌বে এই বিদ্রোহ কাণ্ডে একলা আমার হাতই আছে তাও নয়—দেশ, কাল, সমাজ, বর্ত্তমানের আইন কানুন তারা সেধে অমায় উত্তেজিত করে তুলেছিল, আর এক সঙ্গে সবাই ঘোমটা খুলে আমার সঙ্গে লেগেও গেল। কথা এই,···নিতান্ত অপরাধী ঠাওরাও...ক্ষমা করো!···

একটা পেশাদারী রকমের ক্ষমা প্রার্থনা ও তারই মধ্যে ছোট্ট একটা নমস্কার ঠুকিয়া অমিতা গারদ ঘরের বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। নীচে নরোত্তমের গাড়ী অমিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বৃন্দাবন যতক্ষণ না অমিতা দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় ততক্ষণ তেমনি দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, সে কিন্তু একবার চাহিলও না। একরাত্রির মধ্যে কত যুগান্তরের ব্যবধানের

মধ্যে আসিয়া পড়িল? তাহার মাথা ঠুকিয়া মরিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু এতখানি প্রতিশোধ স্পৃহা তাহাদের যে তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেও দিবে না,* সাক্ষী রাখিয়া গিয়াছে। প্রহরী বাধা দিবার জন্ত তৈয়ারী হইয়া আছে। তাহাদের তিলে তিলে মরণ সহ্য হইবে, তবু একবারে মরিতে দিয়া যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবে না।

বৃন্দাবন একেই সারারাত্রি ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর ছিল এখন এই উত্তেজনার মুখে আরো কাতর হইয়া উঠিল। ডাকিল, "প্রহরী"......

প্রহরী কাছেই বসিয়া খইনী টিপিতে ছিল উত্তর দিল, "কি চাই? হুকুম হোক বাবু সাহেব?"

বৃন্দাবন কাতর কণ্ঠে বলিল, "একটু আমায় জল আনিয়ে দিতে পারো? ভারি তেষ্টা পেয়েছে আমার ভিতরে মরুভূমির পিপাসা জেগে উঠেছে।...

প্রহরী পাঁড়েজীকে জল আনিবার হুকুম করিল, জল আনিতে না আনিতেই আবার বলিয়া উঠিল, "না প্রয়োজন নেই, গারদখানার জল আমি গ্রহণ করবো না। তার চাইতে পিপাসায় তিলে তিলে শুকিয়ে মরবো সেই ভালো!"

পাঁড়েজী জল লইয়া ফিরিয়া গেল।

বৃন্দাবন বাহিরের দিকে চহিয়া ভাবিতে লাগিল, কাল এমন সময় পর্য্যন্ত আমি ভাল ছিলাম, কিন্তু একরাত্রির মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া ইহারা উন্মাদ বানাইয়া দিল, তবে ছাড়িল। সাহায্যকারী হইল এক ডাক্তার, সমস্ত ডাক্তার জাতিটার উপরে তাহার একটা মর্ম্মান্তিক ঘৃণা জাগিয়া উঠিল।...পয়সার খাতিরে ইহারা সুস্থ সবল জীবন্ত মানুষেরও কবরের ব্যবস্থা করিতে পারিল। আর সেই ব্যবসাদার নারী ঠাট ছলা কলা যার অতুলন ছিল তাহার তুলনাই খুঁজিয়া পাইল না।

আপনার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিল, যতদূর দৃষ্টি—যায় ধু-ধু ছুটি ছাড়া কিছু নাই—এমন নিঃসঙ্গ ছুটি যে সুস্থ মানুষ হইয়াও উন্মাদদের সহিত একত্র দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে। সে ছুটি চায় নাই, তবু সংসার জোর করিয়া তাহার ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিল, যেন কোথায় সে ঠিক মত আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিল না। এখন পুরা মাত্রায় তাহাদের সম্ভোগ চলুক! হায়রে অপাপবিদ্ধ কন্যা আমার তোমাকেও সেই পিশাচদলের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে হইবে, চক্ষু তাহার ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

এমন সময় আর একজন অফিসার পুনরায় পাঁড়েজীর সহিত জলের গেলাস হস্তে প্রবেশ করিল, অফিসার বলিল, জল খাওয়া হয় নেই, কেন হে বাপু? জানো নল চালিয়ে খাওয়াতে পারি—সে ক্ষমতা আমাদের আছে।

বৃন্দাবন জলের গেলাসটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,…কি দোষে আমার এই শাস্তি তাই জান্তে চাই? আরো পাঁচজন ভাল ডাক্তার আছে তাদের নিয়ে আসাও…রীতিমত এগ্‌জামিন করাও…না এক ধাপ্পাবাজ নারী যা বলবে, তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে হবে?…আমি বলছি আমার স্ত্রী আমার পরে অন্যায় করেছে…

অফিসার হাসিয়া বলিল…তুমি দেখ্‌ছি বাবু লেখা-পড়া শিখেও আস্ত মূর্খ হ'য়ে আছো…এতদিন এই পুলীশ আর তার কয়েদখানার সংস্রবে থেকেও ঠিক বুঝতে পারলে না…এরা কি না করতে পারে?…তুমি এক কণ্ঠে যা মিথ্যে ব'লে প্রমাণ করতে চাইবে…তাই এরা সহস্র জিহ্বায় সত্য ব'লে ধ্রুব বিশ্বাস জাগিয়ে দেবে। এরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না মানো কি? এদের কারখানায় সব তৈরী হয়…জোচ্চোরী ধাপ্পাবাজী, ভণ্ডামী…যদি মুক্তি পেতে চাও…খাসা ভালমানুষটির মত

পাগল সেজে বসে থাকো, অনুগ্রহ ভিক্ষা করো···একদিন মুক্তি তোমার নিকটবর্ত্তী হ'তেও পারে···

বৃন্দাবন স্তম্ভিত হইয়া অফিসারের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এতক্ষণে সত্যই ধারণা হইল প্রতিকার পাইবার কোন আশা ইহাদের কাছে নাই। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে জোড় হাত করিয়া বলিল···ভগবান তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

এমন আকুল কণ্ঠে ভগবানের নাম উচ্চারণ অনেকদিন এ কারা-গৃহে হয় নাই।···

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এতদিন ছিল, একটা উত্তেজনা উন্মাদনার মধ্যে অমিতার দিন কাটিয়াছিল। আজ আর নতুন করিয়া কিছু চিন্তা করিবার নাই, ভাবিবারও নাই! উত্তপ্ত মন শীতল করিবার জন্য বন্ধুদেরও আয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে, বন ভোজন, সমুদ্র স্নান প্রভৃতিতে ছুটিয়া যাওয়া সে সব একপ্রকার সমাধা হইয়া গিয়াছে। যে দিকে তাকায়—দেখে সীমাহীন ধু-ধু ছুটি... নিজের বুকের দিকে চাহিয়া দেখে...সেখানেও কাহারা ছুটির দরখাস্ত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছে,...এত শীঘ্র কিন্তু অমিতার সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা গুলাকে ছুটি দিতে ইচ্ছা নাই...কে যেন ভিতর হইতে আরো চাই বলিয়া তাগিদ দিতেছে, কিন্তু অমিতা, ইন্ধন খুঁজিয়া পাইতেছে না। স্বাধীনতার নামে সে অনেক দূর অবধি ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছিল,

এখন তাহার ঘোড়াও ক্লান্ত হইয়া ছুটি ভিক্ষা করিতেছে। বলিতেছে তাহারও পরিমিত শক্তি, পরিমিত জীবন।—যাহাকে কোনদিন ক্লান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবেনা…বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, সেই নরোত্তম পর্য্যন্ত এখন হাজিরাতে অনুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, বৃহৎ বাড়ীখানাতে মাত্র সে একা,…কন্যার বাড়ী ভাল লাগে না বলিয়া সে স্কুলের বোর্ডিংয়েই আছে, প্রথমটা কন্যা বোর্ডিংএ থাকিতে অমত করিয়া ছিল, সেই জোর করিয়া লেখাপড়ার শিক্ষার অজুহাতে কন্যাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, তখন কন্যাকে পাঠাইবার একটা দরকার বোধ হইয়াছিল, আজ সে যদি কন্যার সহিত দেখা করিতেও যায়…কন্যা মুখটী নীচু করিয়া মায়ের সহিত দেখা করিয়া যায়, বেশী কথা কহিতে তাহার কোথায় যেন বাধে, বাড়ী আসিবার কথা তুলিলে সে-ও ঐ পড়া শুনার কথা তুলে, যেন সেও কি তাহার গোপন-তম কদর্য্যতম, কিছু একটা ধরিয়া ফেলিয়াছে, প্রথমটা অমিতা এ সব দিকে ভ্রুক্ষেপ করিবার দরকার আছে মনে করিত না। কতজন কত অপবাদই তাহাকে দিয়াছিল, সে গায়ের জোরে এ সব অখ্যাতি উড়াইয়া দিয়া চলিতে ছিল। আজ জন-সাধারণের কথায় তাহাকেও উত্তর দিতে হয়।

অমিতার ভয় হইল—হয় ত সেও একদিন তাহার স্বামীর মত নিজের বাড়ীতে নিজে বন্দী হইবে।

ঘরের কোনে একলা চাহিয়া বসিয়া থাকে, মনে হয়—আকাশ তাহাকে বাহির হইতে ভ্রুকুটী করিতেছে। নিজের নিতান্ত আত্মীয় স্বজনদের পর্য্যন্ত তাহার পরে আস্থা কমিয়া যাইতেছে। আগে তাহার দাদা রোজ খবর লইতে লোক পাঠাইত—এখন সপ্তাহেও লোক পাঠাইবার কি নিজে আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। নিতান্ত সামান্য, তুচ্ছ, কারণগুলা তাহার চক্ষে অত্যন্ত বড় হইয়া তাহাকে যেন পীড়ন করিতে থাকে।

বন্ধুরা পরামর্শ দিল চেঞ্জে যাও। পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিয়াও যাওয়া হইল না। কেমন মন বলিল—প্রয়োজন নেই—নূতন উত্তেজনা সংগ্রহ করিবার জন্য নানারকম ফন্দী খাটাইতে লাগিল। তাহার মন্ত্রী আসিয়া বলিল—এই ত হাতের কাছে মস্ত একটা কাজ পড়ে রয়েছে, মেয়ের বিবাহ দাও। অমিতা যেন অকুল সমুদ্রে কুল পাওয়ার মত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, ঠিক বলেছ, মেয়ের বিয়ে দিয়ে তারপর চেঞ্জে যাওয়া যাবে।

অমিতা নরোত্তমকে বলিল—একটা পাত্র দেখে দাও ভাই।

নরোত্তম বলিল, পাত্রের অভাব কি? ঐ যে সেই বিলেত ফেরৎ ডাক্তারের একটী ভাই আছে সে বিয়েতে টাকাকড়ি কিছু নেবে না, বিলেতে তার ভাইটির ব্যারিষ্টারী পড়ার খরচাটা মাত্র দিলেই হবে।

অমিতা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—হবে ত?...

নরোত্তম বলিল,—নিশ্চয়।

খুসী হইয়া নরোত্তমের জন্য চায়ের অর্ডার দিয়া দিল। চা আসিল, দুই জনেই বসিয়া চা খাইতে লাগিল।

সহসা কি ভাবিয়া অমিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কই মিঃ সিং এদ্দিন ত অনেক ঘোরাঘুরী করলে, যা মানুষের করবার নয়—তাও করলে, কিন্তু তোমার সেই আঁধার রাণীকে পেলে কি?...যার শুধু পায়ের শব্দটি-ই মাত্র শুনেছিলে!

নরোত্তম অবাক হইয়া অমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমিতা বলিল—বিস্মিত হয়ো না, এ সত্যি কথা যে, যা—চেয়েছিলে, তা পেলে না। যত তাকে পাবো বলে—এগিয়ে যেতে গেলে, ততই সে দুর্বোধ্য হ'য়ে আরো আঁধারে তলিয়ে গেল।

নরোত্তম হাসিয়া বলিল,—তুমি দেখছি একটি জ্যোতিষী, মানুষের

মনের কথা আশ্চর্য্য কৌশলে বের করতে পারো। আচ্ছা বলতে পারো কি করলে সে রাণীকে আমি পাই।···

অমিতা একটা অকারণ কটাক্ষপাত করিয়া, নরোত্তমকে বিহ্বল করিয়া তুলিল···বলিল,···সে খবর তোমায় দেব, কিন্তু আজ নয়।

নরোত্তম ফস্ করিয়া অমিতার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দেবে ত?" না···শুধুই একটা কৌতূহলকে বাড়িয়ে চলবে?···

নরোত্তমের এই ভিক্ষুকের মত প্রার্থনার চাহনিটা, অমিতার ভারি মধুর ঠেকিত। আজও ঠেকিল। নিজের উপর একটু খুসীও হইল, ভাবিল এখনো তাহার পরাজয়ের অবস্থা ঘটে নাই। তার রূপ, যৌবন, এবং কটাক্ষের শক্তি সমান অব্যাহত আছে।

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নরোত্তম বসিয়া রহিল, ইচ্ছাটা আজকের মত এখানে থাকিয়া যায়। কতবার কত চেষ্টা সে করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই, আর সবই অমিতার কাছে না চাহিতেই পাইয়াছে, এই খানটায় কেন যে তাহার প্রবল "না"···তাহা নরোত্তম আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

ঐ "না"এর জন্য তার মনটাও দিনকতক খিচলাইয়া গিয়াছিল, আবার নিজের গরজেই সে আসিয়াছে, অমিতা জিজ্ঞাসা করিল···

···"বিয়ে করলে না কেন? তোমার দিদি যে তোমার বিয়ের কথা বলছিল।"

নরোত্তম বলিল—একদিনেই ত বলেছি, আমার মন প্রাণ, সেই আঁধার রাণীর পেছন পেছন—পোষমানা হরিণীর মত চলেছে।···

অমিতা বলিল – ধরো একদিন যদি রাণী মতই দেয়।···

নরোত্তমের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এ নারীর সাহসকে জানিত, দুঃসাহসের দিকে অবাধ গতি দেখিয়া ভয়ানক অবাক হইয়া গেল।

অমিতা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না হে এটা ঠাট্টা মাত্র। সত্যি বলছি, বিয়ে করো, লোকে নানা রকম অপবাদও ত দিতে পারে, দিতে পারে কেন, ধরো না দিচ্চেই—আর তা সত্যেই!···মিথ্যে হয় প্রতিবাদ করতে একটা জোর পাওয়া যায়। সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে কি নিয়ে···?

নরোত্তম ভাবিত হইয়াই উঠিল। অমিতা মনে করাইয়া দিল, আগামী দিনে ভাবী পাত্রটীকেও যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসা হয়।

নরোত্তম ঘাড় নাড়িয়া, গুড নাইট জানাইয়া বিদায় লইল।

পরের দিনে তাহার দাদার বাড়ীতেও সংবাদ পাঠাইল। দাদা খবর দিল,—এর মধ্যে এত শীগ্‌গীর মেয়ের বে দেবে? অমিতার কিন্তু মনের ইচ্ছা তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহটি দিয়া কোথাও চলিয়া যাইবে। অপবাদের বোঝা দিন দিন দুর্ব্বিসহ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। পাত্রের পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতিতে আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না, যেহেতু গ্রাজুয়েট ছেলে, এবং ভবিষ্যতেও ব্যারিষ্টার হইবার ভরসা রাখে। দিনস্থির করিয়া মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাছে সংবাদ পাঠানো হইল।

মায়ের কথার বাধ্য মেয়ে, বাড়ী আসিতে আপত্তি করিল না। মা খুসী হইল। এক জায়গায় অমিতার ভারি সঙ্কোচ হইতেছিল—মেয়ের বাপ যাই হোক—একবার একটা অসভ্য পাড়া-গেঁয়োকে ধরিয়া মেয়ের বিবাহের একটা অগ্নিসাক্ষী বাগদান করিয়া গিয়াছে। মেয়ে যদি সেই সূত্র ধরিয়া বাঁকিয়া বসে,—ভাবনার কারণ ছিল। অতি সহজে সেই দায়টা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখন শুভ কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, তাহারও এক তরফা ছুটি।

অমিতা রেখাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁ মা তোর দেশের সেই বুড়ী দিদিমাকে আনতে পাঠাবো?

রেখা সংক্ষেপে বলিল—কি দরকার ?

স্নেহময়ী মা মেয়ের মতেই মত দিয়া ও প্রস্তাবটা স্থগিত রাখাই ভাল মনে করিল, সেই বুড়িটা এই বাড়ীখানার মতের যেন একটা মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ, তাহাকে ছাঁটিয়া দেওয়াতে বিবাহের আনন্দ কল্পনাটা অনেকখানা যেন সুষ্ঠু আকার ধারণ করিল।—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে বিবাহ আয়োজনের ধূম লাগিয়া গিয়াছে, অমিতাও হাতে একটা নতুন কাজ পাইয়া তাহাতে মাতিয়া গিয়াছে। পড়শীর অনেক সদরওয়ালা, ডেপুটী, ও অপিসের বড় বাবুর স্ত্রী, ইতিমধ্যেই দু-একবার দেখা-শুনা করিয়া গিয়াছেন, অমিতার আপনার জনের অভাব। পড়শীরাই তাহার আপনার জন।

অনেকে আড়ালে আবডালে বলিল, পাগল হইলেই বা—মেয়ের বিবাহের সময়, মেয়ের বাপকে একবার জেলখানা হইতে আনাইয়া লইলে কি ক্ষতি ছিল ?

কথাটা রেখাও শুনিল, এবং নীরবে দুটি ফোটা চোখের জল মুছিল। জ্ঞান হইয়া অবধি রেখা স্পষ্ট বুঝিতেছিল একটা বড় রকম জোচ্চুরি এই ব্যাপারটার মধ্যে আছে, তাহাকে কেহ কোন দিন ডাকিয়া কোন কথা বলে নাই, তবু সে সব শুনিয়াছে,···তাহার মায়ের সহস্র সাবধানতা সত্ত্বেও···আকাশ, বাতাস, তাহারা বলিয়া দিয়াছে, তাহার বাবা উন্মাদ

ছিল না…তার মা-ই জেলে ঢোকাইয়া উন্মাদ করিয়া দিয়াছে। প্রথমতঃ একটা মস্ত সন্দেহের কারণ এই যে…এক রাত্রের মধ্যে কোন মানুষ উন্মাদ হইয়া নিজের স্ত্রী কন্যাকে কাটিবার জন্য, খাঁড়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না।

রেখা ত তাহার বাবার স্বভাব জানিত। কত ভালবাসিত এই মেয়েটাকে,…সে কতবার বাপের সহিত দেখা করিতে যাইবে বলিয়া চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতে তাহার আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। কেন হয় নাই…তাহার কারণ তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য…কিন্তু কারণটা অনুমান করিতে পারা যায়। সমস্ত সংসার তাহার মাকে ভয় করিয়া চলিতেছে. তাহার চোখ রাঙানী…তাহার সিংহিনীর মত দর্প…একটা ভাবনার বিষয়। …নইলে আসল ব্যাপার কাহারও কাছে ছাপা নাই। নফর সরকার সেই কি কিছু না জানে?…কিন্তু তবু সবাই নির্ব্বাক,…ভয়ে সবাই স্তব্ধ হইয়া আছে। সত্যকথা প্রকাশ করিয়া বলিতেও তাহাদের কুণ্ঠার অন্ত নাই।

রেখা অত্যন্ত মন-মরা হইয়াছিল। মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও চেষ্টা করিয়া এ সঙ্কোচ কুণ্ঠার হাত এড়াইতে পারিতেছিল না। তাহার মা-ও তাই সেটা লক্ষ্য করিয়া, পড়শীদের কাছ হইতে সঙ্গিনী আনিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।—তাহারা দিবা-রাত্র রেখাকে লইয়া গানে, গল্পে,…ভুলাইয়া রাখিবে এম্নি কথা ছিল, এত করিয়াও তবু ফল পাওয়া যাইতেছে কৈ? সহসা কথা কহিতে কহিতে রেখা অত্যন্ত অন্যমনা হইয়া পড়ে। হু-হু শব্দে আপনি চোখ দিয়া জল বাহির হয়। সঙ্গিনীদের সঙ্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনে গিয়া দাঁড়ায়, আর কি যেন সংকল্প আঁটে, তাহার মামাতো বোন্‌রা, তাহার মামী, তাহাকে অলঙ্কার পরিতে ডাকে, সে উদাস হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে কেবল তাহাদের দিকে

তাকায়। যদি নিতান্ত ধরিয়া পারিয়া পরাইয়া দেয়, খানিক বাদেই ঘরে খুলিয়া রাখিয়া আইসে।

সকলেই ভাবিল···আর কিছু নয়, মেয়ের বাপের জন্য মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে। হাজার হোক নিজের বাপ বটে ত?

সহানুভূতির বাঁধা বুলি তাহার কাণের কাছে বর্ষিত হইতে থাকে। অমিতা এমন ঘোষণা করিল যে কেহ তাহার মেয়ের হাসিমুখ দখাইতে পারিবে, সেই তাহার কাছ হইতে বকশিষ্ পাইবে। পয়সা দিয়া যদি হাসি কিনিতে পাওয়া যাইত তাহা হইলে অমিতা অসম্ভব মূল্য দিয়াও কন্যার জন্য সে হাসি কিনিতে আপত্তি ছিল না। এই মেয়ের হাসির অভাব দেখিয়া সেও যেন, কাজে-কর্ম্মে তেমন জোর পাইতেছিল না। মেয়ে যদি ফুটিয়া প্রকাশ করিয়া বলে, এইখানে আমার অভাব, তাহা হইলে সম্ভব হউক···অসম্ভব হউক···প্রতিকার করিবার একটা চেষ্টা করিতে পারা যায়। সে তার বাপের মত মুখে কিছু বলিবে না, ভিতরে যত ব্যথা জমা করিয়া রাখিতেছে। অমিতা নিজে একবার গায়ে হলুদের আগে রাত্রে···মেয়ের কাছে আসিয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "বলি রেখা বল্ দেখি, আমার আর কেউ ছেলে'পিলে পাঁচটা আছে? তুই ত আমার ছেলে মেয়ে সব···এমন ধারা গুম খেয়ে রয়েছিস কেন বল দেখি?

রেখার ঠোঁটের আগায় কি একটা কথা বাহিরে আসিতে চাহিল, কিন্তু বাহির করিতে পারিল না। অসহ্য বেদনার ভারে দুই চোখ বাহিয়া শুধু কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

অমিতা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—কেন জামাই পছন্দ হয়নি?··· সবাই ত এক কথায় বলছে গুণে, জ্ঞানে, ধনে এমন জামাইটি দেশে দুর্লভ।

রেখা তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়াও তাহার আসল কথাটা মাকে বলিতে পারিল না। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

তখন কেবল তাহার যজ্ঞ কুণ্ডের সম্মুখে, সেই দীপ্ত পঞ্চশিখের মূর্ত্তির কথা মনে পড়িতেছিল, তাহার বাপের সম্মুখে, আগুনের সম্মুখে যে মন্ত্রটা পড়িয়াছিল, সেটা ত কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিল না— যাহাকে একবার আহ্বান করিয়াছে জীবনে···তাহার সমস্ত প্রাণ মন দিয়া—আবার তাহাকে কি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে? নারীর সতীত্ব ত এতটা খেলার সামগ্রী নয়। একটা জাতির ভবিষ্যত যে তাহার পবিত্রতার উপর নির্ভর করিতেছে। রেখা আর যাই কিছু হইতে পারে···সতী-ধর্ম্মের অপহ্নব ঘটাইতে পারেনা।

অমিতা আবার আপনার কাজে চলিযা গেল। রেখা ভাবিয়া দেখিল, তাহার মনের কথা যদি খুলিয়া বলে—তাহা হইলে কিছুতে সে নিষ্কৃতি পাইবে না। এখন হইতেই তাহাকে আটক করিয়া ফেলিবে। ভাবিতে লাগিল,—ভাবিয়াও কুল কিনারা দেখিতে পাইল না। অথচ তাহাকে বাঁচিতেও হইবে।

* * * *

প্রভাতে উঠিয়া কিন্তু রেখাকে কোথাও পাওয়া গেল না। সে তাহার সমবয়সী সখীদের সহিত একত্র শুইয়াছিল, তার পর কোথায় গিয়াছে কেহ তার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। চারদিকে একটা খোঁজ্ খোঁজ্ রব পড়িয়া গেল। অমিতা হাল ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, এতদিন কেহ কোনদিন তাহার চক্ষে জল দেখে নাই, আজ তার চোখের জলে সত্যই একটা নূতন রকম ভাবের সৃষ্টি করিল।—

বেলা প্রায় দশটা।…পিয়নের কাছ হইতে নেত্য-ঝি একখানা পত্র পাইল, নেত্য রেখার হাতের লেখা চিনিত, বাড়ীর সকলকেই ডাকিয়া জমা করিয়া বলিল—এই পত্র নিশ্চয় রেখা দিয়ে গেছে, পড়োদেখি, সবাই একসঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা তাহার মায়ের নামেই সে লিখিয়াছিল।

"মা ভেবে দেখলুম বিয়ে আমার আর হ'তে পারে না, দুবার বিবাহ অসম্ভব। তাতে দ্বি-চারিণী হ'তে হয়। তুমিও মা জানো কার সঙ্গে কোথায় আমি বাগ-দত্তা ছিলুম। জেনে শুনে এই আয়োজন কেন যে করছো—বুঝে ওঠবার শক্তি আমার নেই। বাপ যে মেয়েকে একবার সম্প্রদান করেছে, মা সেই মেয়ে আর একজনকে আর একবার সম্প্রদান করতে পারে না। তাতে গোলমেলে রকম একটা সত্ত্বা-সত্ত্বির কথা এসে পড়ে, বাপেরই মেয়েকে সম্প্রদান করবার কথা। মা রক্ত দিয়ে মেয়েকে মানুষ করেছে সত্যি,—কিন্তু বাইরের জগতে বাপের স্থান মায়ের স্থানের ঢের উঁচুতে। আমি চাই, দুয়েরই সম্মান বজায় থাকুক। এই সম্মান বজায় করতে হ'লে আমাকে ঘর ছেড়ে বেড়ুতেই হবে। তোমাকেও আমি এ কথা বলতে পারতুম, কিন্তু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কার সাধ্য? তুমি এত শক্তি সঞ্চয় করেছ—বাপকেও যখন পরাভব স্বীকার ক'রে কয়েদখানায় থাকতে হয়েছে, তখন আমি কি তুচ্ছ?…তাই আমি চল্লুম, আমার বাপের গাঁয়ে, সেখানে আমার বাগ-দত্ত স্বামীকেও পাবো। মেয়ে মানুষের সতীত্বটা বড় অবহেলার জিনিষ নয়, মা…যে ইচ্ছা মাত্র প্রয়োজনের খাতিরে তার গলায় ছুরি চালিয়ে দেব। তার চাইতে আত্মহত্যাও ভাল।" ইতি রেখা।

লেখা পড়িয়া সকলের সকল সন্দেহ কাটিয়া গেল। অমিতাও বুঝিল, তাহার আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেছে। তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল

নেত্য ঝি-ই সম্ভব, মেয়েকে সব শিখাইয়া পড়াইয়া ভিতরকার সব কথা শোনাইয়া, এ বাড়ী হইতে সরাইয়া দিয়াছে।

চক্ষু দুটা রক্তবর্ণ করিয়া অমিতা নেত্যকে ডাকিল, "নেত্য!"...

নেত্য কাঁপিতে কাঁপিতে হাজির হইল। অমিতা বলিল, "তুই সম্ভব. নানারকম পাঁচখানি ক'রে লাগিয়ে মেয়েকে তার বাপের বাড়ী পাঠাতে সাহায্য ক'রেছিস্, আচ্ছা কি বলেছিলি বল্।"...

নেত্য জোড় হাত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,..."সত্যি বলছি রাণীমা কিছুই বলিনি।"

অমিতা বলিল,..."তবে এত কথা সে পেলো কোথা হতে?"......

নেত্য বলিল, "তুমি ত মা বিশ্বাস করবে না, নইলে আমরা জানি কথার হাত পা আছে, কথা যদি সত্যি হয়—একদিন তা বেড়িয়ে পড়বেই, যতই ঢাকা ঢুকি দিয়ে রাখো"—

অমিতা স্বর আরো কঠোর করিয়া বলিল,—"কি সত্যি তাই বলনা শুনি।"—

নেত্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ঐ দেখ মা আমি ত বনু, কথারই হাত পা আছে, আমার কি গরজ? চোখের সামনে কতই দেখলুম, কাউকে কি আর বলেছি? আমরা হলুম গরীব লোক, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি মা।...

আর তীব্রতার উচ্চ সীমায় অমিতা উঠিতে পারিল না। তার স্বর আপনি নীচু হইয়া গেল।

যেন সে একটা মন্ত্র-নিরুদ্ধ সাপ, তার ফণা উদ্যত ছিল, আনত হইয়া পড়িল! অমিতা তখন তার দাদাকে একবার সোণাখালি যাইতে বলিল, সিদ্ধেশ্বরের বাতের পীড়াটা অনেকখানি নরম হইয়াছে। তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন তাঁহারা অত্যন্ত গোলমেলে

ঠেকিতে লাগিল; আর কাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, নরোত্তম কিন্তু আগে হইতে বলিয়া বসিল, তাহার যাইবার অবসর ঘটিবে না।

সিদ্ধেশ্বরও স্বরটা···অত্যন্ত উগ্র করিয়া বলিলেন, "তোমার যাবার কথা কেউ বলেনি নরোত্তম, তুমি আপনার যেখানে আছো, সেই খানেই থাকো।"

সিদ্ধেশ্বরের এই স্বরটা···নরোত্তমের যেন অত্যন্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। এমনটুকু হইতে পারিবে যে···তাহার কল্পনা করিতে পারে নাই। ভাবিল তিনিও সব শুনিয়া ফেলিয়াছেন নাকি?

একদিন সে লোক নিন্দা অখ্যাতি অপবাদকে অতি তুচ্ছ বলিয়া সেগুলা গ্রামের সীমানার বাহিরে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিত। আজ তাহারও মাথা হেঁট হইল। এবং আশ্চর্য্য হইয়া আবিষ্কার করিল, যাহা ভাবিয়াছিল তাহা ত নয়। যে মানুষের সমাজ নীতি, অনুশাসন, মানুষেরই সৃষ্ট অনর্থক···বলিয়া ভাবিত, মানুষের স্বাধীনতা-পথে যেগুলা বাধা স্বরূপ বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত—দেখিল, তাহাদের অস্তিত্ব তাহার অস্তিত্বের চাইতে ঢের বেশী মূল্যবান। সমষ্টির যে বাক্‌শক্তি ও জিহ্বা রহিয়াছে, তাহার দুরতিক্রম্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া আসা একান্ত দুঃসাধ্য। অমিতার সতীত্বের সম্ভ্রম বোধকে সেই একদিন যুক্তিতর্কের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, ওটা হাল ফ্যাসানের···একচারিণী ব্রত মাত্র। উহার সঙ্গে ইহকাল পরকালের···কোন সম্পর্কই নাই। সেই ইহকাল পরকাল বোধ বর্জ্জিতা অমিতাও···দূরে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফণা অবনত করিয়া কোথায় মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিতে চাহিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতেছেনা বটে, কিন্তু ভাবে ভঙ্গিমায় কণ্ঠস্বরের উষ্মতায় সেই জ্বালাই উদ্‌গমন করিতেছে।

যাহা আকাশ বাতাসে পর্য্যন্ত—একটা দুরপণেয় কলঙ্কের কালিমায় মণ্ডিত করিরা রাখিয়াছে। সভয়ে আরও আবিষ্কার করিল, যাহা অন্যায়—সত্যকারই অন্যায়—তাহার পশ্চাতে একটা আঘাত আছে—মানুষের বোধ শক্তিকে বিজ্ঞ ডাক্তারের মত ইনজেকশান চালাইয়া, পঙ্গু করিয়া দিলেও, সে তার কবরের মধ্য হইতেও আঘাতের প্রতিবাদ করিবে—এবং ন্যায় ও সত্যের বিজয় গাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রায় তিনদিনের পর, সিদ্ধেশ্বর সোনাখালি হইতে ফিরিয় আসিলেন, এতটা দেরী হইবার কারণ কি—তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তবে দেরী যে হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলিলেন।" —অমিতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ দাদা মেয়ের খবর কি আগে বলো।"

সিদ্ধেশ্বর, স্বর একটু ঝাঁঝালো করিয়া বলিলেন,…"কেন? মেয়ের খবর তুমি আমা অপেক্ষা ত ভালই জানতে।"…

অমিতা যথাসম্ভব সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল…আমি কি ভাল জানতুম দাদা?

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, কেন জানতে না? অগ্নি, ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে যেদিন কন্যাকে বৃন্দাবন বাগত্তান ক'রে ছিল, রামচন্দ্র বেদান্ত র'ত্নের মুখে শুনলাম, তাই ত একরকম বিবাহ…তুমি সব জেনে শুনেও এ আয়োজন কেন ক'রে ছিলে তাই জান্তে চাই?…

অমিতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল…"দাদা সে কি একটা বিবাহ, না সেই পাত্রই রেখার উপযুক্ত পাত্র? তখন তাঁর পুরা উন্মাদ অবস্থা।"…

সিদ্ধেশ্বর একটা হুঙ্কার দিয়া বলিলেন…"চোপরাও বলছি, এতখানি মিথ্যে আর বানাতে চেষ্টা ক'রো না…আমি সব শুনেছি আচ্ছা, এ জ্ঞানটা তোদের কোনদিন হয় নি,…এতটা মিথ্যে কোন কালে টেঁকে থাকতে পারে না। শুধু বুদ্ধি দিয়ে…কিম্বা চালাকিতে কাজ উদ্ধার হয় বটে, কিন্তু তারপর?

"সত্যি বলছি দাদা"…বলিতে যাইয়া অমিতার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। কথাটাও সে শেষ করিতে পারিল না।

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "তুই নিজের মনেই ভেবে গ্যাখ্…কতবড় অপকর্ম্ম করেছিস্, সেই নরোত্তমটা গেল কোথায়? তাকে একবার দেখি, তেমন জামাই পঞ্চশিখ, নরোত্তমটা আমায় বুঝিয়ে বল্লে কি না…"পিলে রোগা দিনে তিনবার মরচে। মরতে দিনে তোরাই তিনবার করে মরছিস, যার চোখ আছে সেই দেখতে পাচ্ছে। আমি পাড়া গাঁ কখনো যাইনি, দেখিনি, কিন্তু যা দেখলুম…মানুষ যদি কোনদিন জগতে টিঁকে থাকতে পারে…তবে ঐ পাড়াগেঁয়েদের পথ ধরে…। তোমরা তর্ক করবে, বলবে, ওরকম ঘরকুনো হ'য়ে বেঁচে থাকার চাইতে না থাকাই ভালো, একটু সংস্কার ক'রে নিলে পঞ্চশিখ আদি যেমন ক'রেচে, আমি সেখানে গিয়ে অতীত ভারতবর্ষের বাণী শুনতে পেলুম। "শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম" আমার মন ভক্তিতে ভরে গেল।

সিদ্ধেশ্বরকেও যেন একটা উন্মাদনায় পাইয়া বসিয়াছিল। আশে পাশের যাহারা তাঁহার কথা শুনিতে আসিয়াছিল, তাহাদের শোনাইবার জন্য আরও বলিতে লাগিলেন। "হয় ত তোমরা দেখবে গিয়ে…সেখানে বিলাসের উপকরণ নেই, সাবান, বাস তেল, কলের জল কি সোডাওয়াটার

তার ষোল আনাই অভাব আছে, ঘরে ঘরে বাড়ীর দোরে মেঠাইওয়ালারও দোকান নেই, অনেক জিনিষই নাই, না থাকলেও ত কাজ আটকাচ্ছে না। খবরের কাগজ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো রোজ সন্ধ্যেবেলায় পঞ্চশিখের কাছে শুনতে আসে, কেমন সব ভক্তিনম্র ভাব. মেঠাইএর অভাব মুড়ি গুড়ে চালিয়ে নিচ্ছে···আমি সেখানে যা টাটকা ইক্ষু গুড় খেয়ে এসেছি, তার তুলনায় কোন সন্দেশই নাই। অমিতা···এত ভুল বুঝেছিলি তুই···একবারে ঢেউ দেখেই "লা" ডুবিয়ে দিলি ?" রেখাকে দেখলুম সে খুব স্বচ্ছন্দেই আছে, আমার কাছে একবার কাঁদলো বটে···সে তার নিজের অভাব অভিযোগের জন্য নয়। কাঁদলে তার মায়ের মতি বিপর্য্যয়ের কথাগুলি একটি একটি করে' বলতে···বলতে···পণ্ডিত রামচন্দ্র ইতি মধ্যে, রেখা যেতেই সমাজের দিক হ'তে বিবাহের সংস্কারটা সেরে নিয়েছে, লাল পেড়ে সাড়ী আর সিঁথের সিঁদুর টুকুতে কি যে···তাকে মানাচ্ছে, তা কাকে বলবো। সোনার চুড়িগুলিও খুলে ফেলেছে, তার জায়গার উঠেছে শাঁখা। শুধু শাঁখা সাড়ীতে এত রূপ যে খোলে তা ত জানতুম না···তার পিসী আমায় বল্লে "বেহাই সোনা দেখে, দেখে, সোনা নিয়ে নাড়া চাড়া করে, তোমাদের মন সোনার সন্ধানেই একবারে নিডুবী হ'য়ে গেছে, সোনা ছাড়াও জগতে মানুষের আরও বড় জিনিষ আছে তা চোখের চশমাটা খুলে একবার দেখবে কি ?···হ্যাঁরে অমিতা শোন্।

চারিদিকে নানা লোক-জন ছিল বলিয়া তিনি তাঁর বক্তব্যটাকে সব শেষ করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। অমিতাকেই বলিলেন, আচ্ছা···তোরা সব খাওয়া-দাওয়া ক'রে নে, তারপর ওবেলার দিকে বলবো।

অমিতা তাহা জানিত তাহার দাদা কি বলিবে, তাহার স্বামীর

কথাই যে বলিবে। তাহাতে ভুল ছিল না। মেয়েও যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সব বলিয়াছে তখন মিথ্যা কি হয়? তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হইয়াছে, সে হত্যাপরাধে আসামীদের কাঠগড়ায় খুনে পর্য্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে। এখন উপায় কি?

আহারে...বিহারে, কেবলি ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিতে লাগিল। মেয়ের ভাবনাও ভুলিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল—এ পাতক ঘাড়ে করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহার দেশ ছাড়িয়া যাওয়াই শ্রেয়। থাকে থাকে কেবলি চমকাইয়া উঠে···হয়ত বা লাল পাগড়ীর দল, তাহার দেউরীর কাছেই জমায়েত হইয়াছে, যেমন তেমন হত্যা নয়,—নিজের স্বামীকে হত্যা—তাকে পাগলা গারদে ঠেলিয়া দেওয়া···অমিতা আপনার মনেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল..."না সেই মাত্র একলা দোষী নয়। তাহার সহকারীও একজন আছে।"

লীলাবতী তাহাকে বৈকালের দিকে ছাদের সিঁড়ির রাস্তায় গ্রেপ্তার করিয়া বলিল,—"বলি ঠাকুরঝী আজ কেবল তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন? কখনো দেখছি ছাদের উপরে, কখনো চিলে কোটার ঘরে, এত বড় বাড়ীতে যেন মন আর তোমার টিকছে না, কি হ'লো বলতো ভাই শুনি।"

অমিতা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গিয়া বলিল,..."কেন দাদা কি কিছু বলছিলো তোমায়? বল না ভাই?" যেন সে অমিতা আর নয়।

লীলা পরিহাস করিয়া বলিল, "হাঁ তাই ত বলছিলেন, বলছিলেন ঠাকুর জামাইকে পাগলা গারদে ঠেলতে···যদি কেউ থাকে সে তুমি!"

"আমি?"···স্বরের অস্বাভাবিকতায় লীলাও চমকাইয়া উঠিল। দেখিল চক্ষু তাহার কপালের দিকে উঠিয়াছে এবং কি যেন কি হাতড়াইয়া

বেড়াইতেছে। এ রকম দৃশ্য কিন্তু কখনো তাহার নজরে পড়ে নাই—লীলা হাসিয়া বলিতে যাইতেছিল,..."বলি ঠাকুরঝী, তাতে তোমার···"

অমিতা তাহার মুখে হাতটা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল,···"সবটা শোন আগে, দোষটা কেবল আমারই একলা নয়! যদি কিছু সয়তানী ক'রে থাকি সে তোমাদেরই যোগে,···তোমরা না সহায় হ'লে কি সাধ্যি ছিল?···ঐ যে তোমরা আজ সাধুত্বের বড়াই কচ্চো—আমার এ জীবনটার গোড়ায় আগুন ধরিয়ে দেবার মূলে কে?·· দাদা নয়?—দাদা আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিল স্বীকার করি, কিন্তু বিয়ে দিলো কোথায়—এক প্রৌঢ় বিপত্নীকের সঙ্গে, আমিও তখন টাকাকড়ি গহনা গাঁটির বহর দেখে ভুলে গেলুম। মনকে বোঝালুম, মন এ জন্মটা এইরকম অরসিকের সঙ্গেই কাটিয়ে নাও! তারপর মেয়েও একটা কোলে পেলুম। ভাবলুম আর চাই কি, আমি সন্তানের মা হ'য়েছি···নারী জন্মের শ্রেষ্ঠ গৌরবের উত্তরাধিকারী আমি, আমি মা, তারপর আবার একদিন বাঁশী বেজে উঠ্‌লো—নিতান্ত অবেলায়···যখন যৌবনের প্রথম উন্মাদনাটা কেটে গেছে, আমি সবে তখন ঘর-কন্নায় মন দিয়েছি,"—

লীলা হাসিয়া উঠিতেছিল, অমিতা দৃঢ় হস্তে লীলার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"হাসি নয় ঠাট্টা নয় এ সত্যি কথা বৌ।···তোমারা আমার কথা শোনো, তার পর দোষ দিও।"

লীলা হাসিয়া বলিল, "তারপর আর কি বল্‌বি, বলবি...নষ্টের বাঁশীতে কুল মজালুম, এই ত?—"

অমিতা নয়নতারা বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সত্যি তাই, সে তোমারই ভাই...প্রথম যৌবনে একদিন যে কামনার ধনের মত...আমার বুকের কলিজাতে আঁকা হ'য়ে পড়েছিল—তোমরা তা জেনেওছিলে; তবু বিয়ে দাওনি, তাকে বিলেত পাঠিয়ে দিলে। সেও যখন তার বুকভরা

ক্ষুধা নিয়ে আবার আমার পাশে এসে দাঁড়ালো—তখন মতি স্থির রাখাই··· উচিত ছিল···বলচো বটে, কিন্তু তা কেউ পারে? চিরটা কাল স্বাধীনতার শিক্ষাই শিখে এসেছিলুম···তোমার ভাইও তার কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমায় বোঝাল সমাজের রীতি, শাসন সব মানুষকে দগ্ধে মারবার অস্ত্র মাত্র মানুষের মুক্তির জন্য আমাদের ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করা উচিত। আমাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেখালো... রাষ্ট্র ক্ষেত্রেও ঐ এক অবস্থা রাজতন্ত্র আর পুরোহিত তন্ত্র এই দুটো তন্ত্রই মানুষকে সব চাইতে বেশী পেষণ করেছে, আমরাও তাই ভাঙবার মন্ত্র নিয়ে বেড়িয়ে পড়লুম—কিন্তু ভাঙতে ভাঙলুম নিজের বুকেরই কলিজাটা···আর পবিত্রতা ব'লে যে জিনিষ তাকে বিসর্জ্জন দিলুম।"

অনুতপ্তার কথায় লীলাও বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া উঠিল, সেও গোড়া হইতে কতকটা জানিতেও পারিয়াছিল, অথচ তখন কোন কথাটি কহে নাই। অমিতার হাত ধরিয়া ছাদে লইয়া আসিল। অমিতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন বেলাও বেশী ছিল না। অস্তরবির শেষ রশ্মিটি সারা কলিকাতা সহরের বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধশীর্ষ হইতে একটা অপরূপ দ্যুতি ঝরিয়া পড়িতেছিল।

অমিতা বলিল, "ভাই বৌদি, আমি আত্মহত্যা করবো। দাদাও সব শুনেছেন···ওঃ—"

লীলা স্তোক বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তিনি আর কি ক'রে সব শুনবেন বলো—তবে যাও জেনেছেন, তাতে তোমার ভয়ের কারণ নেই।"

অমিতা একটা জল চৌকির উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল

ঠিক এই সময় সিঁড়ির পথে লাঠি ঠক ঠক্ শুনিতে পাওয়া গেল, যেন লাঠি ধরিয়া কে উপরে উঠিতেছেন।

লীলা বুঝিল তাহার স্বামীই আসিতেছেন···অমিতা চমকাইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ বৌদি, দাদা আসছেন না?"

লীলা বলিল,..."হাঁ।"

অমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল,...কোথায় লুকোই বৌদি;—বৌদি তুমি একটু আড়াল ক'রেই দাঁড়াও।"

লীলা তাহাকে আড়াল করিয়াই বলিল, "তোমার এ সন্ধ্যেবেলায় এখানে কি প্রয়োজন?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "এখানে অমিতা রয়েছে, না?"

লীলা বলিল,..."হাঁ আছে।"

অমিতার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর চৌকীটার উপর বসিয়া পড়িয়া ডাকিলেন, "অমিতা···"

অমিতা নিঃশব্দে মাথাটী নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "যা হবার তাত হ'য়েই গেছে, যা করবার তা ত ক'রেই ফেলেছিস্, কৃতকর্ম্মের ফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে। সে শাস্তি মানুষ নিজের মনের কাছ হ'তে যা পায়···বাইরের লোকের গঞ্জনা তার কাছে ত তুষার শীতল।···যাক্, এখন একটা কাজ কর্ দেখি, তোকে একবার রাঁচী যেতে হবে। তুই গিয়ে সার্টিফাই না করলে সে বেচারার নিষ্কৃতি নেই।"

অমিতা তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া বলিল, "আমি জানি যে দাদা...তিনি উন্মাদ।"

সিদ্ধেশ্বর একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "খবরদার বল্‌ছি অমিতা, এতখানি মিথ্যে সয় না। আমি শুনেছি, উন্মাদ ত সে কোনদিনই

ছিল না তোরাই তাকে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছিস্।...অত্যাচারে আর নির্য্যাতনে।"...

অমিতা খানিক গুম হইয়া থাকিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "তাহ'লে এখন কি করতে হবে তাই বলো।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "তুই কেবল আমার সঙ্গে যাবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। হাঁ আর একটা কথা বলে যাচ্ছি, নরোত্তম যেন এ বড়ীতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ না করে।" বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, আবার তাঁহার বাতের পীড়ার প্রকোপ বাড়িয়াছিল বলিয়া লাঠি লইয়াই চলিতে হইতেছিল।

লীলাও তাহার স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া গেল।

অমিতা এই সন্ধ্যার আঁধারে একলা ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া রহিয়া গেল। তাহার অস্তিত্বটা যেন আছে কি নাই এম্নি একটা সম্ভাবনার মধ্যে ছায়ার মত কাঁপিতে লাগিল। অমিতার মনে হইল, যদি সে এখন এই জগৎজোড়া আঁধারের মধ্যে অসীম আঁধারেই মিশাইয়া যায়...তাহা হইলে পৃথিবীর কর্ম্ম কোলাহলে কোথাও এক মিনিটের জন্য দাঁড়ি পড়িবে না। ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সে যদি আত্মহত্যা করে, তা হইলেই বা কি? কিসের জন্য এই সঙ্কোচ...এই দিবারাত্র তীব্র যাতনার মর্ম্মভেদী দাহ।...মেয়ে শুদ্ধ যদি পর হইয়া গেল তবে পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজনই বা কি?

কাঁদিতে লাগিল তাও যেন ছায়ানটের ছন্দ তালে, অমিতার প্রাণে একান্ত অরুচী হইয়া পড়িয়াছিল, সে মুহ্যমানার মত সেইখানেই বসিয়া রহিল। আকাশের সমস্ত অন্ধকার তাহার বুকের উপর বড় একখানা পাথর ভারের মত চাপিয়া বসিল। দমবন্ধ হইয়া মরাই তাহার ভাল ছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"অমিতা! অমিতা!"

এই রাত্রিই যেন মায়াময়ী হইয়া অমিতাকে একটা ডাক দিল। চাহিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিক-চক্রবাল সীমায় চাঁদ উঠিতেছে, যেন একটা গোরস্থানের পাশ হইতেই সে আসিতেছে, মুখে তার মৃত্যু মলিন পাণ্ডুরতা!···অমিতার মনে হইল, ঐ কলঙ্কীই তাহাকে মায়া-কণ্ঠে ডাক দিয়াছিল। রাগ হইল, চাঁদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

"অমিতা"···

সিঁড়ির রাস্তায় একটা পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। যেন দক্ষিণা বাতাসের একটা দমকা আর্ত্তনাদের মত। এ অনাহুত রব কোথায় হইতে ছুটিয়া আসিল?

অমিতা মুখ তুলিয়া দেখিল, নরোত্তম, কেমন একটা অভিমান বোধ হইল। সে বলিতে যাইতে ছিল, সুখের দিনেই অনেককে পাই, দুঃখের দিনে কারো দেখা নাই। কিন্তু নরোত্তমই তাহার কথা বন্ধ করিয়া দিল। বলিল···আচ্ছা অমিতা, তুমি এই বাড়ীতে আসবার কথা বারণ ক'রে দিয়েছ?

অমিতার তাহার দাদার কথাটা মনে পড়িল। ভাবিল, দাদাই সম্ভব বারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন···কে কি তোমায় বল্লে?"

নরোত্তম অভিমান-ক্ষুন্নকণ্ঠে বলিল...কে আবার বলেবে, তোমার দারোয়ানটা...যে পাঁচ ঘণ্টা আগে পর্য্যন্ত সাত ছেলাম জানিয়েছে, আমি জানতে চাই এর মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটে গেল?

অমিতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল···পরিবর্ত্তন একটা ঘটে গেছে, মিঃ সিং।"

"পরিবর্ত্তন?"...বিস্মিত হইয়া নরোত্তম অমিতার মুখের দিকে চাহিল, অমিতা ম্লান-হাস্যে বলিল—"এ সত্যিই নরোত্তম বাবু। এত চেষ্টা করেও আমরা মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারলুম না। একবারে সব প্রকাশ হ'য়ে গেল,—তুমি কিছু শোনোনি? দাদা সোনাখালি হ'তে ফিরে এসেছেন যে, একটা কত বড় ভয়াবহ আয়োজন চলছে যদি শোনো তুমিও স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে, ফুরিয়ে এলো...নরোত্তম বাবু, আমাদের হাসি-খেলার দিন ফুরিয়ে এলো!...

স্বরে যেন মূর্ত্তিমান হতাশার সুর নামিয়া আসিল। নরোত্তমও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, গলদটা তাহার দিক হইতেও কম ছিল না। অন্য সময়ে যে কথা শুদ্ধ তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এ সময়ে সে কথায় তাহাকেও খানিক দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইল।

অমিতা আবার বলিল, দাদা রাঁচি যাচ্চেন, আমাকে শুদ্ধ যেতে বল্লেন, আমি কি ক'রে যাবো তাই ভাবছি, আমি আমার স্বামীর সামনে দাঁড়াবো কি করে? নরোত্তম বাবু কিছু উপায় ঠাউরেছ?

নরোত্তম একটা সিগারেটে আগুণ ধরাইয়া টানিতে ছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় একটা যুক্তি সংগ্রহ করিয়া বলিল,...কিসের উপায় অমিতা? তুমি আমি দুনিয়ায় কারই বা তোয়াক্কা রাখি? তোমার দাদা তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, যাবে না? প্লেন জবাব দিয়ে দেবে। তোমার দাদাই সম্ভব দারোয়ানটাকে আমি যাতে না আসি তাই ব'লে দিয়ে গেছে। কেমন?

অমিতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল...খুব সম্ভব... তাই হবে।

নরোত্তম খুব জোরে সিগারেটটাতে একটা টান দিয়া বলিল, দাঁড়াও আমায় খানিক ভাবতে দাও।"

অমিতা হতাশার সুরে বলিল...যদি আমি না-ই যাই; তাদের স্ত্রী

সাজাবার লোকেরও অভাব ঘটবে না। আমার দাদা শুদ্ধ যখন যোগ দিয়েছেন।

নরোত্তম বলিল—হতাশ হলেও ত উপায় নেই অমিতা, শেষ পর্য্যন্ত হাল ধরে থাকতেই হবে।

অমিতা বলিল···শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ভরা-ডুবি হবে এ সুনিশ্চয়। খানিক ভাবিয়া লইয়া বলিল—একটা কাজ করবে?

নরোত্তম বলিল—কি?

অমিতার কথাটা বলিতে কেমন বাধিতে ছিল, আলিসার ধারে মুখ লুকাইয়া আপন মনেই হাসিয়া উঠিল।

নরোত্তম সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের ঢাকাটা সরাইয়া দিয়া বলিল ···এত লজ্জাই বা কিসের?"···ব'লে ফেল না!

অমিতা তাহার হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল :—ঐ চাঁদ দেখ। ঐ আকাশের চাঁদ!···সুন্দর···কলঙ্ক রঞ্জিত...

নরোত্তম উন্মত্তের মত অমিতার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, চাঁদ ত তুমিই এই ধরার উপরে—"

অমিতা সরিয়া আসিয়া বলিল—"ঠাট্টা নয়, ঠিক ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।—কি দেখ্‌ছো?···কয়েকটা রেখা, তাও নয়। একটা ছায়াচ্ছন্ন মৃত্যুর ছায়া চারিদিক হ'তে তাকে ঘিরে ধরেছে, দেখছো?

নরোত্তম বিহ্বলের মত অমিতাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বনাচ্ছন্ন করিয়া বলিল...তাতে কি অমিতা।··একটা লোকাপবাদ চারিদিক হ'তে আমাদের দিকে সাগরের ঢেউএর মত ছুটে আসছে, তাতে কি?—আমরা ভালবাসার গোলাপ বনে বেরিয়েছি, গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত সইতেই হবে। আজ তাই গোলাপ-বাগের কবি, সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটা কবিতা মনে পড়ছে।

"সরাব চাহি আরো সরাব—
আনরে সাকী·ফুল বাগান...
মেঘের আঁধার অনেক যখন,
খুশীর ঝলক চাই সমান!"

অমিতা বলিল...তুমিও তাই সেই সম্রাট কবির মত, এই মেহেরকে বিবাহ ক'রে ফ্যালো—একটা ঝঞ্ঝাট চুকে যাক।

নরোত্তম বলিল...আবার সেই বিবাহ সেই বাঁধি বুলি, সেই নিয়ম-তন্ত্র, সেই সামাজিক বিধি নিষেধের নাগপাশ,...অমিতা আমরা কখনো মানুষের গড়া আইন মেনে চলিনি, তার আইনকে কেবল দুপায়ে ক'রে দলেই গিয়েছি, আবার তুমি তাই প্রার্থনা করো? একদিনেই তোমায় বলিনি, রাজতন্ত্র আর পুরোহিত তন্ত্র এই দুটো তন্ত্র পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বুকের উপর পাথরের ভারের মত বসে আছে। বাইরের মানুষ যে যাই ভাবুক...আমরা মানুষেরই মুক্তির জন্য বেরিয়ে পড়েছি।

অমিতা আস্তে আস্তে নরোত্তমের হাত ছাড়াইয়া লইল। নরোত্তম বলিল...অমিতা তুমি এতে অসুখী হ'লে?

অমিতা ছোট্ট করিয়া "উঁহু" বলিয়া ঘাড় নাড়িল। নরোত্তম আরো কি বলিতে যাইতেছিল, অমিতা বলিল,...আর শুনেছ, মেয়ের কাছ পর্য্যন্ত এই কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে।

নরোত্তম বলিল—তা হোক।...

অমিতা বলিল...তোমার ভাণ্ডারে এমন কিছু ভেল্কী আছে, সব ছাপিয়ে একটা নতুন কিছু বানাতে পারো।...তোমার বাঁধি বুলিতে কাজ হবে না তা বলে রাখছি, আমাকেই আর ভোলাতে পারলে না—

তা অপরে ভুলবে কি ?···সেই যেমন প্রথম সম্মোহন মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ছিলে—আমি যাতে মুগ্ধ হ'য়ে ছিলুম—পারবে ?

নরোত্তম আর একটা সিগারেট ধরাইল। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল অমিতার মনে কিঞ্চিত ভ্রান্তি দেখা দিয়াছে, ভ্রান্তি জন্মিবারই কথা···নিজের মেয়ে, যে মেয়ের জন্য জগতে করে নাই এমন কাজ ছিল না—সেই মেয়েও যখন বাঁকিয়া অন্য মতেই চলিল···তখন সে সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াই বাহির হইতে চাহে।

নরোত্তম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিল,···আমার একটা গল্প শুনবে, অমিতা।

অমিতা বলিল···কি ?

নরোত্তম বলিল, দেখ ছেলেবেলায় যখন আমার মামার বাড়ীতে যেতুম, তখন বাউরী পাড়ায় ভারি একটী সুন্দরী বউকে দেখতুম। কৌতুহল হ'লো, পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম সে এক বিধবা গোয়ালার মেয়ে, বাউরীদের একজন তাকে বের ক'রে নিয়ে এসে নিকে ক'রেছে, তারপর আবার বছর কতক পরে গিয়ে তার খোঁজ নিলুম। নদীর ধারে দেখি, একপাল ছেলে-পিলে নিয়ে সে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্চে ; স্বামী তার তখনো তাকে ছাড়েনি বটে, কিন্তু রূপ যৌবন আদি ক'রে কিছু নেই। দেখে ভারি দুঃখ হ'লো, ভাবলুম বেচারা যদি বিবাহের বিপাকে না পড়তো তবে এতখানি কষ্টের মধ্যে পচতে হ'তো না। গোড়ায় তারা স্বাধীন ভালবাসার খাতিরেই বেরিয়ে প'ড়েছিল, দেখ তারপর কি দুর্গতি !···আমি জানি যে মানুষের বিধি নিষেধের হাড় কাটে একবার গলা এগিয়ে দিয়েছে, আপনা হ'তেই তাকে জবাই হ'তে হবে।

অমিতা চৌকিটায় বসিয়াছিল, উঠিয়া পড়িল, অন্তশ্চক্ষে দেখিতে পাইল, সে গোয়লাদের মেয়ে হইতে মোটেই একচুল উপরে নয়। তেমনি

একটা দুর্দ্দমনীয় কামোন্মাদ লইয়া সে-ও বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে। কেমন যেন অস্থির হইয়া ছাদের উপরটায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নরোত্তমও ভাবিল, হয়ত প্রয়োগটা তাহার ঠিক মত হয় নাই। টুপিটা মাথায় দিয়া বলিল...দারোয়ানটাকে তা হলে ওম্নি একটু বলে কহে দিও।

নিতান্ত সহজ সুরে অমিতা বলিল, যদি দারোয়ানটা আমার কথা নাই শোনে...নরোত্তম বাবু।

"শুনবে না বল কি? তুমি হ'লে বাড়ীর মালিক, কালকেই ওর জবাব দিয়ে দেবে।" নরোত্তম অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া অমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমিতা বলিল,...আমার যা প্রধান বল, তা যে দাদা নিজের হাতে নিয়ে গেছেন সে খবর রাখো? ব্যাঙ্কের বই, শেয়ারের কাগজ, এক-খানি আমার কাছে নেই, কি নিয়ে লড়বো?

নরোত্তম গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল...তুমি বুদ্ধিমতী হয়েও এ কাজটা করতে পারলে?...দিলে কেন?

অমিতা নিরুত্তরে রহিল।

নরোত্তম অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিলে কখন?...বুঝি তাঁর খাবারের সময়—

অমিতা বলিল...হাঁ।

নরোত্তম বলিল, তা'হলে গয়না কখানি মাত্র পুঁজি থাকলো...এই মূলধনে বিবাহ করতে চাইছিলে?

..."কেন তুমি খাওয়াতে পারতে না আমায়?...

বিকট একটা ভ্রুকুটি করিয়া নরোত্তম হুট্ হুট্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। অন্য দিন গুডনাইটও বলিয়া যাইত—আজ আর তাহাও বলিয়া

গেল না। তাহার ভালবাসর মূল নির্ণয় করিতে অমিতার আর মোটে ভাবিতে হইল না। অমিতা ভাবিল, স্বার্থ...অর্থলোভ আর কামের তাড়নায় যে পুরুষ ভলবাসিতে আইসে, সেই ভালবাসাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা কত বড় যে আত্ম প্রবঞ্চনা...অমিতা ঠেকিয়া তবে আপনার কাছে আপনার ভুল স্বীকার করিল।

আকাশের প্রত্যেকটী তারা তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। দক্ষিণা বাতাসের উচ্ছ্বসিত নৈশগীতি তাহারই বুকের ব্যথাকে রূপ দিয়া...অনন্ত অজানায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অমিতা বুঝিতে পারে নাই এত শীঘ্রই তাহার পতনটা দেখিতে পাইবে। আকাশের পাণ্ডুর চাঁদ নরকের একটা বিভীষিকা লইয়া পৃথিবীর শেষ দিক্-প্রান্তে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পরে বৃন্দাবন চন্দ্রের পুরানো বন্ধু-বান্ধবদল আবার তাহার দুয়ারে আসিয়া জটলা পাকাইতেছিল। এতদিন কাজের তাড়া বলিয়া কেহ বড় একটা খোঁজ লইতে পারে নাই। যেই শুনিল, বৃন্দাবনের কয়েদ হইয়া গিয়াছে, ঘরে তাহার যুবতী স্ত্রী...একলা, তখন তাহাদের পুরাণো ভালবাসা উথলিয়া উঠিল। আর্টিষ্ট অমল তখন প্রায় প্রত্যেক দিন আসিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা—সে যদি এই বাড়ীতে একটা কাজ পাইয়া যায়, তবে কিছু গোছাইয়া লইতে পারে। কিন্তু সব চাইতে বড় দুঃসংবাদ ...গত কয় রোজ হইতে গৃহ-কর্ত্রীরও খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। তিনি

কোথায় যে গিয়াছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। সকলেই পস্তাইতেছে যে বড় অসময়ে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্ষেত্রনাথ শপথ করিয়া বলিল আমি যদি এখানে থাকিতে পারিতাম, মা-কে কিছুতে এ বাড়ী ছাড়া হইতে দিতাম না। তবে একটা সান্ত্বনার কথা আছে অমিতা স্বামীর মুক্তির জন্য লিখিয়া পড়িয়া যাহা দিবার...তাহা দিয়া গিয়াছে। অমিতার দাদাও রাঁচী এস্যাইলামে গিয়াছেন এখন—তাঁহারও কোন খবর নাই। সকলে আশা করিতেছে, স্বামীর সুস্থ হওয়ার সংবাদ পাইয়া খুব সম্ভব স্বামীকে আনিবার জন্যই দাদার সঙ্গে রাঁচী গিয়াছেন। তবে স্থির নিশ্চয়তা কিছু নাই।

বাড়ীর দারোয়ান পাঁড়েজী সিদ্ধি ঘুঁটিতে ছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহার কাছ হইতেও এক গ্লাস চাহিয়া লইল। এবং পাঁড়েজীকে বলিল, এই রকম ভাঙের নেশায় সে বড়ই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, বৃন্দাবন বাবু থাকিতে বড় পথে ছুটিয়াছিল, এখন পয়সার অভাবে এই ক্ষুদ্র নেশাই অবলম্বন করিতে হইয়াছে—

দারোয়ানটা অবজ্ঞাভরে বলিল, "আরে বাবু হামি জানে বাঙালী বড় ফজুল খরচি জাত আছে।" কেহই সে কথার সত্যতা সম্বন্ধে অস্বীকার করিতে পারিল না। সকলেই অফিসের ফেরতা এতদূর আসিয়াছিল, চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, দেখা গেল, এক সন্ন্যাসীও এইখানে "ওঁ—শান্তি শান্তিঃ" বলিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষেত্রনাথ কি তেজচন্দ্রের সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মোটে চিনিতে বিলম্ব হইল না। খুসিও কেহ হইতে পারিল না। তেজচন্দ্রের কেমন রাগ হইল, মনে মনে বলিল, "এই সব ভণ্ডের দলই—বৃন্দাবনের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ মুখ ফুটিয়াই বলিল, "বাবা, আর বুজরুকীতে কাজ কি—সড়ে পড়োনা—বাড়ীর মালিক যিনি, তিনি ত এখন পাগলা জেলে—"

সন্ন্যাসী কাহারও দিকে দৃকপাত না করিয়া যথারীতি বেঞ্চিটার উপরে বসিয়া পড়িয়া কাঁধ হইতে ঝোলাটি কোলের উপর নামাইয়া রাখিল। মাথায় বাবরী কাটা চুলটায় হাত লাগাইয়া খানিক স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। দারোয়ানটার সিদ্ধি ঘোঁটা তখনও শেষ হয় নাই। তাহাকে বলিল, "আরে ব্যাটা এমন নেশা চালাও, যার আর ছাড়া ছাড়ি নেই।"

যোগেন্দ্রনাথ মুখটা বেজার করিয়া বলিল, "খুব হ'য়েছে নাও ঠাকুর ওই ক'রে একটা আস্ত উকীল মানুষের মাথা—খেলে, আবার গরীবদের পেছনে লাগা কেন? খবর নেওয়া হ'য়েছে কি যে বাবু জেলে আছেন? তেজ বাবু যা বলছিলেন ব্যাটাদের খালি বুজরুকী!"

সন্ন্যাসী উপরের দিকে মুখ করিয়া চোখ দুটাকে আরও উঁচুতে টানিয়া বলিল,—"আরে বেটী তবে যে বল্লি, আসচে,—দেখিস বেটী বেশী চালাকিটি করবি ত—তোর সব বাজী বুজী ভেঙ্গে দেব। আমার আবার কাকে তোয়াক্কা?···নচ্ছার বেটী তোরি ভূতের বোঝা নিয়েই ত দেশে দেশে ছুটে মরা,—মা শুনতে পাচ্ছিস, এরা গালাগালি করচে।"

আর্টিষ্টিক অমলচন্দ্রের অসহ্য হইয়া পড়িল। বলিল, "দোহাই সাধু বাবা এখন আপনার স্থানে যাও, তার পর যেখানে যার সঙ্গে খুসী—আকাশের সঙ্গে কথা কওগে?"—

সন্ন্যাসীটি হাসিয়া বলিল, "তোমার যে বড় ঝালা দেখতে পাচ্চি, একটা ধারা পাবার বড়ই সাধ ছিল, পেলে না তাই মন প্রাণ বিষিয়ে উঠ্‌ছে! আরে ছিন্নমস্তার খেলায় এখনও অনেক বাকী যে··· দে বেটী ..এরাও তৃষিত হয়েছে, এদেরও একটা একটা ধারা ধরিয়ে দে, জানেনা ত নিজের বুকের রক্তে কি তৃপ্তি!—"

অমল আরো চটিয়া উঠিল। তেজচন্দ্র বলিল, "তোমরা এর কিছু মানে বুঝতে পাচ্ছো?"

অমল বলিল, "কথাই নয় তার আবার মানে হবে কি? স্রেফ গাঁজাখুরি! জোচ্চুরি।"—

সন্ন্যাসী একটা হুঙ্কার দিয়া বলিল,—"কি বল্লি জোচ্চুরী? তোদের চাইতেও জোচ্চোর আজ পর্য্যন্ত জন্মেছে?" ওপরের দিকে মুখ করিয়া বলি, শুনলি, "মা মহামায়ে," ওরা সাধনা করচে তোর ছিন্নমস্তা রূপ, মুখে বলছে তাদের তুল্য ভদ্র আর নেই, এতবড় ভয়ানক সুন্দর শঠ পোষাকী সাধু দুনিয়ার হাটে আর কোনদিন কেউ দেখেছিস? ভাগারে মরা পচা শুনেই না ওরা ছুটেছিলো—তবু বলবে আমরা সাধু!—ওরে সাধু যে দেখ্‌গে সে পাগলা গারদে..ক'টি লোক কেউ তোদের দাপটে টিঁকতে পারে?···হাতে তোরা কল্ পেয়েছিস্—আইন পেয়েছিস্—কিন্তু শেষটা ভেঙ্গে পড়তেই হবে। ওই ত্থাখ্ যার মঙ্গল ঘট তোরা পায়ে ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলি—সেই আবার সুধার কলস কাঁধে নিয়ে আসচে। তোদের নতুন রূপ দেবে মা! মা!"

সন্ন্যাসীর এই ভাবোন্মত্ত প্রলাপ শুনিতে মন্দ লাগিতেছিল না বলিয়া সকলে শুনিয়াই যাইতেছিল। সহসা সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, "গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছিস তোরা? আমি পেয়েছি, কিন্তু ও কি দেখতে পাচ্ছি?—মা, মা সর্ব্বনাশী!—"

সন্ধ্যার আঁধারে একখানা গাড়ী আসিয়া এই বড় বড়ীর দুয়ারে লাগিল। সকলে চাহিয়া দেখিল গাড়ী হইতে সিদ্ধেশ্বর অবতরণ করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ সিদ্ধেশ্বরকে চিনিত, বলিল,—"কাকা বাবু জামাই বাবুর খবর কি? তিনি কি তাহ'লে খালাস পেলেন না নাকি?"

সিদ্ধেশ্বর "হুঁ" বলিয়াই বাড়ীর ভিতরের দিকে উঠিয়া গেলেন.

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা-জীকা কই খবর মিলা ?

"নেহি হুজুর" বলিয়া দারোয়ানটা যেখানে যেখানে সন্ধান লওয়া হইয়াছিল, বলিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ বলিল, আমরা ত মনে ক'রেছিলুম মা বোধ হয় আপনার সঙ্গেই আসছেন।"

সিদ্ধেশ্বর "না" সূচক ঘাড় নাড়িয়া ইহারা সকলে কে, এবং ইহাদের পরিচয় কি জানিয়া লইলেন, সন্ন্যাসীটীরও পরিচয় লওয়া হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, একজন খাঁটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম, জানতাম তিনি খালাস পাবেনই।"

আর্টিষ্ট অমল আর সামলাইতে পারিল না তার চুলের কেশর ফুলাইয়া বলিল, "শুনুন একবার মশাই বুজরুকিটা,—উনি জানতেন, উনি সবই জানতেন···এসেছিলেন নাট্যারম্ভে, আবার যাচ্ছেনও নাট্যের শেষে, কি বলবো—আমার হাতে যদি আইন থাকতো, তাহ'লে পৃথিবীর বুকের এই মূর্ত্তিমান ধ্বংশ গুলোকে এককালে লোপ পাইয়ে দিতুম। ওদের কাজকি একবার শুনুন, সংসারী মানুষ বেশ খাসা আপনার সংসার নিয়ে চালাচ্ছে খাচ্ছে, দাচ্ছে, ওঁরা কোথা হ'তে একদিন শাঁক বাজিয়ে এসে বল্লেন—ওরে পাপী তাপী করছিস কি ?···কার ভূতের বোঝা কে তুই বইছিস ? সংসারে ছেলেই বা কে মেয়েই বা কে ? একটা ধোঁকার টাটিতে মজে আছিস বৈত না—স্বল্প বুদ্ধির সংসারী ভাবলে হবেও বা, কতই আমি মহা পাতকী, কাউকে বা আবার বল্লে তুইত মানুষ নস্—শাপভ্রষ্ট দেবতা, তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে থাকবি কি ?···আমাদের বৃন্দাবন বাবুটীকে এই এরাই কজনে মিলে ত খেলেন। ক্ষেত্রনাথ আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "বেড়ে ব'লেছ অমল বাবু। ও ব্যাটাদের মুখের সামনেই স্পষ্ট জবাব দেওয়া ভাল।"

সন্ন্যাসীর চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল। কিন্তু তবু কিছু বলিতেছিল না। সিদ্ধেশ্বর কহিলেন, "তাহলে তোমরা বৃন্দাবন বাবুর কথাও কিছু শুনে যাও। তাঁর মত যে সন্ন্যাসীর মতের সঙ্গে হু-বহু মিলে যায়। তিনি আমাকেও কি বলেছিলেন সেটা তোমাদেরও কাণে করা উচিত। বল্লেন দেশকে, পল্লীর মধ্য হ'তে নতুন জন্ম নিতে হবে। বিশেষ ক'রে এই কথাটা বার বার বলতে লাগলেন, বড় বড় সহরে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে যা গড়ে উঠ্‌ছে, তা অদ্ভুত রকমের মোহন শাঠ্য...মুখে তার এমন নির্জ্জলা স্তুতিবাদ শুনবে—তোমায় স্তম্ভিত হ'তে হবে। এক একটা নগর নয় পৃথিবীর বুকের উপর মৃত্যু রেখা, সেখানকার কারখানায় যা তৈরী হচ্ছে বিষ বাষ্পের মত তা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়চে, আর মানুষ বাঁচবার নামে যা করতে লেগে গেছে দস্যুবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের ফিরে আসতে হবে—কলের ধোঁয়া ছেড়ে আবার কুটীরের দিকে, শিখতে হবে মনুষ্যত্ব...শিখতে হবে ভালবাসা...আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি এই হাওড়ায় নেমে, কলকাতাতেও আর এলেন না। মেয়ের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। অমিতাও সম্ভব ঐ পাড়াগাঁয়েই গেছে!"

সন্ন্যাসী আনন্দ গদ-গদ কণ্ঠে "জিতা রহো ব্যাটা" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। এবং অন্যসকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ তেজচন্দ্র আদি করিয়া ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না পাড়াগাঁয়ে মানুষের কি করিয়া বাস করা চলিতে পারে? কাগজ কলম আপিস তাহারা কি শতক্রোশ দূরে বহিয়া লইয়া যাইবে? আর্টিষ্ট বলিল, তাহা ছাড়া সেখানে থিয়েটার বায়োস্কোপ ম্যুজিয়ম কি আছে? অনেক আলোচনার পর সকলের এইটাই সাব্যস্ত হইল

বৃন্দাবনের মাথা যেমন বিকৃতভাবাপন্ন ছিল তেমনি থাকিয়া যাইবে, এবং তাহার যুবতী স্ত্রী যথানিয়মে এই কলিকাতায় থাকিয়া স্বামীর ভাবের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ হইয়া স্বামীকুল এবং পিতৃকুল উজ্জ্বল করিতে থাকিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে সিদ্ধেশ্বর বৃন্দাবন চন্দ্রকে হতাশ সংবাদই লিখিয়া পাঠাইলেন, অনেক খোঁজ লইয়াও যখন জানা গেল না অমিতা কোথায় গিয়াছে, তখন আর কি করা যাইবে—খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও হইতে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না—যাহার পরে সব চাইতে বেশী সন্দেহ ছিল দেখা গেল সে একাকীই কলকাতায় রহিয়াছে। বৃন্দাবনও লিখিয়া পাঠাইল আমাদের যতদূর কর্ত্তব্য তাহা যখন করিয়া দেখা গেল, তখন ধর্ম্মের কাছেও আমাদের খালাস বিবেচনা করিতে হইবে।

পণ্ডিত রামচন্দ্র, স্মৃতি হইতে ব্যবস্থা তুলিয়া বলিলেন, "সে যখন স্বেচ্ছায় বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন তাহার পরে কোন কর্ত্তব্যই নাই। দ্বাদশ বৎসরান্তে কুশ পুত্তলিকা দাহ করিয়া পিণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে। যে ব্যথা কোনমতেই অমিতার পরে জাগা উচিত ছিল না—সে ব্যথা, ফল্গুনদীর নিঃশব্দ প্রবাহের মত বৃন্দাবন ও রেখার সমস্ত কাজ কর্ম্মে—সমস্ত সাংসারিক সুখ দুঃখে জাগিয়া রহিল। একদিন যে গৃহের দেবী ছিল কোন দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় ভাঙ্গিবার একটা উত্তেজনায় আপনাকেই ভাঙিয়া চুরিয়া বিদায় লইল।

* * * * *

বছর আষ্টেকের পরে আবার এম্নি একটি শীতের দিন আসিয়াছে, পৌষ পার্ব্বণের দিবস, রেখা গৃহিণী-পদাভিষিক্ত, তাহার একটী পুত্র, ও একটী কন্যা হইয়াছে কন্যাটি ছোট, পুত্রটি পাঠশালে যায়। সে তাহার সঙ্গী বন্ধুদের জুটাইয়া আনিয়া প্রভাত-রৌদ্রে পিঠ রাখিয়া বড় একটা কলার পাতায় বসিয়া পড়িয়াছে, মা তাহাদের পিঠা আনিয়া দিতেছে, তাহারা সবান্ধব খাইয়া যাইতেছে, রেখার মেয়েটীও একধারে একটু ঠাঁই পাইয়াছে, সে বেচারা খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অদূরে মেনি বিড়ালটাও এক আধটা অনুগ্রহের দান পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া আবার জিভ চাঁটিতেছে, দূরে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ-খানি হাতে করিয়া বৃন্দাবন একদৃষ্টে এই পৌষ পার্ব্বনের ছবিটির পানে চাহিয়া ছিল, ভিতর হইতে আনন্দ বেদনার একটা উচ্ছাস তাহাকে নিতান্ত উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে। এই মা ও ছেলেদের ছবি দেখিয়া তাহার যেন আশা আর মিটিতেছিল না। ঘরে ঘরে এই মা···এই ছবিই সে কামনা করিয়া ফিরিয়াছিল। কার্য্য ব্যস্ততায় রেখা চুলগুলিও তাহার বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। লাল শাড়ীর আঁচলটী মাথার আধখানি অবধি গিয়াছে, মুখে তার মাতৃস্নেহ উছলিয়া পড়িতেছে, ছেলেদের লইয়া থাকিতে হয় বলিয়া গহনা পত্রের বোঝাও সে সরাইয়া ফেলিয়াছে; মাত্র হাতে দু'গাছি সোনার শাঁখা উপর হাতে দু'-গাছি তাগা তাই রাখিয়াছে, গলায় সরু হারটি কেবল তার বাপের অনুরোধে রাখিয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবনের বহুদিনের একটা কথা মনে হইল, ভাবিল আজ যদি সে তাহার মায়ের মত—বিকৃত বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খল সত্য লইয়া এই সংসারে থাকিত—তাহা হইলে সংসার আর সে নিজে দুজনেই পদে পদে হোঁচট খাইয়া মরিত, তারপর শেষ কালে এমন এক জায়গায় আসিয়া

ঠেকিত, সে সঙ্কট মুহূর্ত্ত পার হইতে একজনকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে হইত। হইতে পারে অনেক সংসারে স্বামী কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল, হয়ত বা ঠিক যতটুকু হওয়া উচিত্ত সেরূপ স্ত্রীর প্রতি মমতাঁ-ভাবাপন্ন নয়, তাই বলিয়া মেয়েদের উচিত নয়—সংসার ছাড়িয়া নিজের স্বাধীন জগত বাছিয়া নেওয়া। আর কোন কর্ত্তব্যের খাতিরে না হউক, সন্তানের স্নেহে তাহাকে বাঁধা থাকিতেই হইবে।

মনে পড়িল এই মাকে তাহার বাবা একদিন বলিয়াছিল, "হাঁরে রেখা—সংসার নিয়ে তোর গল্পের বইগুলি, কবিতাগুলি দেখিস্ ত?

রেখা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহার ছেলেদের দেখাইয়া বলিয়াছিল, "বাবা এরাই আমার গল্প কবিতা সব। আর অন্য কবিতা কি দেখব?···

বাবার আনন্দে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চশিখ যজন, যাজন, অধ্যাপনা ও চাস বাস লইয়া থাকিত, কোন দিন বাড়ী আসিতে দেরী করিলে কি রাত্রি হইয়া গেলে, রেখা একবারে ছট ফট করিতে থাকিত। পিতার কাছেই মনটি ভার করিয়া সংবাদ লইবার জন্য বলিতে আসিত! যত রাত্রিই হউক যতক্ষণ না স্বামীর খাওয়া হয় ততক্ষণ সে কিছুতে খাইত না। স্বামী পঞ্চশিখ তাহার জন্য কত অনুযোগ করিয়াছে, রেখা তবু তাহারও কথা শুনে নাই। এতটা বশ্যতা দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। তবু এই মধুর দাসত্বটুকুর মাঝখানে এমন একটা পরিতৃপ্তির শান্তি ছিল যেটুকু শিক্ষার অগ্নিশলাকায় কাহারো খোঁচাইয়া নষ্ট করিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। খানিক নাতিদেরও সহিত মিথ্যাতর্কে কাটিয়া গেল। বৃন্দাবন বড় নাতিটীকে হাঁকিয়া বলিলেন, "ওহে দ্বীপচন্দ্র, এখন ত বেশ পিঠে রোদ্দুর দিয়ে, মায়ের হাতে পিঠে খাচ্ছো, বড় হ'লে ঐ মাকে তোমার কি খাওয়াবে বল দেখি?"

দ্বীপচন্দ্র বলিল, "কেন খাজা গজা রসোগোল্লা।"

বৃন্দাবন বলিল, উহুঁ হলো না। ও ত পয়সা দিলে পাওয়া যায়।"

দ্বীপচন্দ্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, হাঁ হাঁ দাদামশাই আমার মনে প'ড়ে গেছে, মাকে আমার ভক্তিই দেবো।"

"বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

বৃন্দাবন হাসিয়া খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিল, তখন দাওয়ার রৌদ্র ফুরাইয়া আসিয়াছিল, বৃন্দাবন ঘরের মধ্যেই চশমাটি চ'খে লাগাইয়া কাগজ পড়িতে লাগিল ভাবিল, আজকের প্রভাত—তার জীবনে একটা স্মরণীয় প্রভাত।

খবরের কাগজটা খুলিতেই একটা ছবি সর্ব্বাগ্রে তাহার নয়ন পথে পতিত হইল। নাম না পড়িলেও চেনা যায় এ মুখ যে অনেক দিনের অনেক কালের পরিচিত। লাবণ্য অনেক খানি ঝরিয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু চিনিবার পক্ষে মোটে বাধা নাই! থর থর করিয়া সমস্ত বুকের রক্ত...এবং চেয়ার শুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিল। লেখা পড়িতে যায়—পড়িয়া উঠিতে পারে না। অতি কষ্টে ছবির নীচে নামটা মাত্র পড়িতে পারিয়াছিল, সে নাম আর কারো নয়...অমিতার!···

অমিতা! অমিতা! যে নাম একদিন তাহার জপমালা ছিল, কত দীর্ঘ দিনের ব্যবধান—তবু স্মৃতি হইতে মুছিয়া কেলিতে পারিয়াছে কৈ? তারি গর্ভের মেয়ে রেখা···হায় হতভাগিনী।···তাহার বুকের ভিতরে একটা তপ্তশ্বাস বহিয়া গেল।

কাগজখানা হাতে করিয়া পড়িতেও মনে চাহিল না। সে মরিয়াছে এই যথেষ্ট—মৃত্যু ঘটনার পশ্চাতে না জানি কি শোচনীয় কাহিনী

লুক্কায়িত হইয়া আছে। অনেকক্ষণ খবরের কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। পঞ্চশিখ তাহার সামনে দিয়া আহার সারিয়া গঞ্জের স্কুলে অধ্যাপনার কাজে গেল। ছেলেরাও গেল, তখনও বৃন্দাবন খবরের কাগজখানি হাতে করিয়াই রহিল। কিছু আগে সে বলিয়াছিল আজকের প্রভাত তাহার জীবনের একটা স্মরণীয় প্রভাত! আবার কিছু পরেই ভাগ্যবিধাতার একি নিষ্ঠুর রকম পরিহাস!

চোখ বুলাইয়া গেল। সম্পাদক লিখিয়াছেন, মৃতার নাম অমিতা—

বাঙালী ঘরের শিক্ষিত লোকের স্ত্রী ছিল স্বামী এককালে বড় উকীল ছিলেন, অমিতা নিজেও সুশিক্ষিতা ছিল, কিন্তু কি রকম বুদ্ধি বিপর্য্যয়···কিছু দিন হইতে স্বামীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক যুবকের পেছনে ছুটিয়াছিল। ভালবাসা লইয়া নয়, একটা প্রতিহিংসা লইয়া···ঢাকায় সে যুবকটীর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, অকস্মাৎ গাত্র হরিদ্রার রাত্রে, গত ২৬শে তারিখে ঢাকায় সে যুবকটীকে আশ্চর্য্য রকমে হত্যা করিয়া বসে, যুবকটীর নাম নরোত্তম, বড় দরের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনায়ার ছিল। নরোত্তম সবে সন্ধ্যা বেলায় আপনার ঘরের মধ্যে কাজ-কর্ম্ম সারিয়া বসিয়াছে, নীচের ঘরে বন্ধু-বান্ধবরা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। সহসা উপর্য্যুপরি রিভলবারের আওয়াজ শুনিয়া বন্ধুরা ছুটিয়া গিয়া দেখে, এক নারী ছুটিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া যাইতেছে, তাহারা যেই নারীটাকে আটকাইয়া ফেলিল, অমনি সে-ও আপনার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক গুলি ছাড়িয়া দিল। আলো লইয়া আসিয়া দেখা গেল, দুই জনেরই শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহ কোন দিন এখানে এই স্ত্রীলোকটীকে নরোত্তমের কাছে দেখে নাই। নারীর কাছে কাপড় চোপড়ের মধ্যে যে কাগজ-পত্র ছিল তাহাই দেখিয়া পরিচয় প্রদান করা গেল, আশ্চর্য্য এই মৃতা তার স্বামীর ফাটাগ্রাফটীকে পর্য্যন্ত শেষ পর্য্যন্ত বুকের

কাছে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। আমরা বারান্তরে সে ফটোগ্রাফও দিব, ফটোগ্রাফের নিম্নে লেখা ছিল "বৃন্দাবন ও অমিতা।"

স্থানান্তরে মৃতার স্বহস্ত লিখিত ডাইরী খানাও প্রকাশিত হইল।

কয়েক ফোটা চখের জল আপনি কাগজ খানার উপর গড়াইয়া পড়িল, বৃন্দাবন চেষ্টা করিয়াও এটা রোধ করিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত তার স্বামীর ফটোগ্রাফ খানাও কেন রাখিয়াছিল কে জানে? হায় অভাগিনী সত্যই কি তোমার অনুশোচনা জাগিয়াছিল? বুঝিয়াছিলে কি স্বাধীনতার নামে কি উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়া ছিলে? কত কথাই বৃন্দাবনের মনে পড়িতে লাগিল। একবার ভাবিল, যদি আসিয়া অমিতা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিত, হয়ত সে ভ্রষ্টা জানিয়াও না ক্ষমা করিয়া পারিত না। মহর্ষি গৌতমও ত অহল্যাকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ক্ষমা চাহিতে পারিল না।

স্থানান্তরের ডাইরিখানাও দেখিয়া লইল। অমিতা লিখিয়াছে।

"একটা সর্ব্বনাশের মুখোমুখী হয়েছি, এতদিন বেশ নিশ্চিন্তে বাংলা দেশের বাইরে যেখানে কেউ আমায় চিনতো না, এমন জায়গায় পড়ে ছিলাম, মিস্ট্রেস হ'যে দিন কাটাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম এই রকম অজ্ঞাতবাসের মধ্য দিয়েই আমার জীবন তরীকে একদিন ওপারের কূলে পৌঁছে দেব। হয়ত ক্ষমা পাব কিম্বা নাই পাব। ঈশ্বর, পরকালে আস্থা কোন দিন করতে পার্‌লুম না। শিরায় শিরায় অবিশ্বাসের একটা অন্ধ বিশ্বাস জাজ্বল্যমান হ'য়ে র'য়েছে। কে আমার মতিচ্ছন্নের জন্ম দায়ী?...আমি একাই নিশ্চয়, কিন্তু সহভাগীও একজন আছে। সে বল্লে ভেঙ্গে ফ্যালো নিয়মের বেড়া—মানুষের আইন, মানুষের গড়া নীতি কোন কালে শাশ্বত নয়। আমি স্থির বিশ্বাসে স্বাধীনতার নামে ভাঙ্গা আরম্ভ ক'রে দিলুম...কিন্তু গড়বার কোন আয়োজনই করিনি। ফল,

এই হ'লো, উত্তেজনার মুখে আমার সতীত্বকে নারীর যা সব চাইতে গৌরবের জিনিষ তাকে ধূলি-মুষ্টির মত ধুলায় ফেলে দিলুম। কোন দিন তার জন্যে ক্ষোভ হয় নি, সে আমার খুনী, আজও ক্ষোভ নেই, ভাঙবার উত্তেজনা এতদূর পেয়ে বসলো নিজের মেয়েকে পর্য্যন্ত দলে টানতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে স্বাধ্বী...তার বাপের রক্ত তার মধ্যে ছিল···সে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড হ'তে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে আপনাকে বাঁচালে। স্বামীকে পাগল সাজিয়ে জেলে দিলুম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারো বিবেকে একটু বাধে নি? বিবেক? কিসের বিবেক?...বিবেক, জ্ঞান সে ত দুর্ব্বলতা! আমাদের শাস্ত্র বলে জয়ই তোমার লক্ষ্য...মনুষ্যত্ব তোমার লক্ষ্য নয়! আমার বাজীকর সেও বার-বার ঐ একই কথা বলে—কথা নয় ত—যেন ভৈরবের ডমরু নাদ! বুকের অন্তস্থল পর্য্যন্ত চঞ্চল ক'রে দেয় কেবল কথার ভেল্কী।...ভেল্কী সে শেষ পর্যান্ত চালিয়েও যেতে পারতো...কিন্তু একদিন তার স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়লো...যে দিন তাকে বল্লুম, বাজীকর আর কেন এইবার আমার প্রাণেশ্বর হও। সে তখন বিশ্রী এক গয়না বৌএর ভবিষ্যত দেখিয়ে আমায় ফিরিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাঙ্কের বই গুলাও কাছে নেই শুনে মুখ ভারী করে চলে গেল। আমার স্বামীর উপার্জ্জনের টাকা, এক আমার আর আমার মেয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খরচ করতে পারি—সে তাতে ভাগীদার হ'তে আশা করবার কে? সেই দিনই তাকে চিনে নিলুম, আর ঘরে ঢুকতে দিলুম না। তারপর স্বামীর মুক্তির উপায় স্থির করে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। এতখানির পর স্বামীর সামনে আর নিশ্চয়ই বের হওয়া চলে না, অজ্ঞাত বাসই বেছে নিলুম। কিছু দিন জাহাঙ্গীরাবাদের মেয়ে স্কুলে চাকরীও চল্‌লো—চাকরী নয় ত লাঞ্ছনা দুর্গতির সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করা—তবু দিন এক রকমে কাটছিল—সহসা সেদিন শুনলুম—